ক্রুসেড-২৬

ভণ্ডপীর

আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ২৬

ভণ্ডপীর

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৫

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ [illegible] ৫০.০০

CRUSADE-26
Bhondopir
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: July 2005

PRICE : [illegible] 50.00

ISBN 984-581-243-0

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৭

ছোট বেগম

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ- 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

মুশেলের এক বয়োবৃদ্ধ দরবেশ। তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এই বয়সে মানুষের মঙ্গল ছাড়া জীবনে তার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। এ জন্যই সবাই তাকে যথেষ্ট কামেল ও মুত্তাকী মনে করতো। লোকজন বলাবলি করতো, 'তার নেক নজরে পড়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

নিজের এবাদত বন্দেগী নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তিনি। সবার মাঝে এই ধারনা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত এই পীর যদি কারো জন্য দোয়া করেন তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা মঞ্জুর করবেন। এ জন্য দলে দলে লোক আসতো তার কাছে। তিনি সবার সাথে কথা বলতেন না, সবাইকে তার সাথে কথা বলার সুযোগও দিতেন না। তবে তিনি যার সাথেই কথা বলতেন সে লোক নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করতো। লোকের ধারনা, তিনি যার সাথে কথা বলেন তার সব আশা পূরণ হয়ে যায়।

এক লোক তাকে শহরের বাইরে একটি পর্ণকুটির দান করেছিল। সেই কুটিরেই থাকতেন তিনি। অল্পদিনের মাঝেই তার কেরামতির কাহিনী শহরের সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি দূর দূরান্তের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়লো তার কেরামতির খবর। ফলে প্রতিদিনই তার ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

ক্রমে তার কুটিরের সামনে জনতার ভীড় লেগে গেলো। প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে আসতে লাগলো সমস্যাগ্রস্ত লোকজন।

তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কুটিরের বাইরে আসতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি আপন হুজরায় বসে এবাদত ও ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। যখন তিনি বাইরে আসতেন তখন খাদেমরা ঘিরে রাখতো তাকে। তিনি বাইরে এসেই দু'হাত উপরে তুলে উপস্থিত জনতাকে শান্ত হতে ইশারা করতেন।

জনতা নিরব হলে তিনি তাদের নসীহত করতেন। তারপর দু'চার জনের সমস্যার কথা শোনার জন্য তাদের নিয়ে যেতেন কুটিরের ভেতরে।

তিনি তাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনে তাদের শান্ত্বনা দিতেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। ভাগ্যবান এই লোক ক'জন প্রশান্ত মন নিয়ে কুটিরের বাইরে চলে যেতো।

তার সাথে কয়েকজন সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান খাদেম থাকতো। তাদের গায়ের রং ছিল ফরসা। তারা আপাদমস্তক সবুজ কাপড়ে সজ্জিত থাকতো।

একদিন তারা উপস্থিত জনতাকে বললো, 'এই কামেল দরবেশ মুশেলবাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি তোমাদের জন্য সুসংবাদ বহন করে এনেছেন।'

এভাবে প্রতিদিন তারা দরবেশ সম্পর্কে নানা রকম কথা শোনাতো। এইসব কথা লোকদের অন্তরে গেঁথে যেতো।

দরবেশ যাদের সাথে কথা বলতেন তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে

লোকদের শোনাতো নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তারা বলতো, 'আমি অমুক বিপদে পড়ে হুজুরের কাছে এসেছিলাম। হুজুরের দোয়ায় আমার আশা পূরণ হয়েছে।'

এইসব প্রচারণার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লোকজন দরবেশকে ইমাম মেহেদী বলে মনে করতে লাগলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'হযরত ঈসা (আ.) আবার দুনিয়ায় নেমে এসেছেন।'

একদিন লোকেরা দেখলো দরবেশ পালকিতে চড়ে মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের মহলের দিকে যাচ্ছেন। সাথে আছে তার খাদেমবৃন্দ।

তারা অবাক হয়ে দেখলো, ইয়াজউদ্দিনের রক্ষী বাহিনী তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে অত্যন্ত তাজিমের সাথে মহলের ভেতরে নিয়ে গেলো।

কয়েক ঘন্টা পর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এলেন এবং নিজের পালকি রেখে ইয়াজউদ্দিনের শাহী টাঙ্গায় চড়ে বসলেন।

লোকজন ভাবলো তিনি নিজের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছেন। তারা হুজুরের সাথে রওনা হলো আস্তানায় গিয়ে হুজুরের কাছ থেকে দোয়া নেবে বলে।

খাদেমরা বললো, 'আপনারা হুজুরের সাথে থাকবেন না। হুজুরের আস্তানায় গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

লোকজন হুজুরের আগেই তার আস্তানায় পৌঁছার জন্য যে যেভাবে পারে ছুটলো।

হুজুরের কুঁড়েঘরের কাছে গিয়ে জড়ো হয়ে বসে রইলো লোকজন। কিন্তু কোথায় হুজুর? সন্ধ্যা নাগাদ না হুজুর ফিরল, না তার খাদেমরা। তারা সেখানে কাউকে না পেয়ে সন্ধ্যার সময় নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হলো। অতি উৎসাহী ভক্তবৃন্দ ফিরে গেল শাহী মহলের গেটে।

দরবেশকে মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের শাহী গাড়ী দূরে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় সেই গাড়ী ফিরে এলো শাহী মহলে। কিন্তু গাড়ীতে হুজুর নেই, সেখানে বসে আছে গাড়ীর চালক ও দু'জন রক্ষী।

জনতা গাড়ী থামিয়ে রক্ষীদের জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'দরবেশ কোথায়?'

'আমরা বলতে পারবো না তিনি কোথায় গেছেন?' এক রক্ষী বললো, 'তিনি আমাদেরকে এক পাহাড়ের ধারে গাড়ী রাখতে বললেন। আমরা গাড়ী থামালে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের আর কষ্ট করার দরকার নেই। এবার তোমরা চলে যাও।'

আমি খাদেমদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দরবেশ আমাদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'হুজুর এ পাহাড়ের কোন এক উপত্যকায় গিয়ে ধ্যানে বসবেন। মুশেলের আমীরের মঙ্গলের জন্য সেখানে তিনি প্রার্থনা করবেন। যতক্ষণ দিগন্তে তিনি কোন মঙ্গল নিশানা দেখতে না পাবেন ততোক্ষণ চলবে এ প্রার্থনা। তারপর তিনি পাহাড় থেকে নেমে মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনকে বলবেন

এখন তার কি করা উচিত।'

রক্ষী আরো বললো, 'সেই খাদেম আমাকে আরো বলেছেন, হুজুরের প্রার্থনা শেষ হলে হুজুরের দোয়া নিয়ে মুশেলের সৈন্যরা যে দিকে যাবে সেদিকের পাহাড় তাদের চলার পথকে সহজ করে দেবে। তাদের সামনে মরুভূমি পড়লে সেই মরুভূমি শস্য শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। শত্রুর সৈন্য বাহিনী তাদের মুখোমুখী হলে দুশমন ফৌজ অন্ধ হয়ে যাবে।

মুশেলের আমীর এই বাহিনী নিয়ে যেখানে গিয়ে পৌছবেন সেখানেই তারা বিজয়ী হবে এবং সেখানে তার রাজত্ব কায়েম হবে। এমনকি যদি সুলতান সালাহউদ্দিনের বাহিনীও তাদের সামনে পড়ে তবে তারা আমীর ইয়াজউদ্দিনের সামনে অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য হবে।'

তিনি আরো বললেন, 'হুজুর স্বপ্নে দেখেছেন, খৃষ্টানরা আমাদের আমীরের গোলামে পরিণত হয়েছে এবং মুশেলবাসী অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ হয়ে গেছে। তারা সোনাদানা ও প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে।'

লোকজন প্রশ্ন করলো, 'তিনি কোন পাহাড়ের উপত্যকায় ধ্যানে বসবেন?'

'সে কথা বলতে বারণ আছে। হুজুর চান না, তিনি যখন ধ্যান করবেন বা প্রার্থনা করবেন তখন কেউ তাতে বিঘ্ন ঘটাক। এ জন্যই তিনি জনপদ থেকে দূরে সরে গেছেন। তাই আমরা বলতে পারবো না, তিনি এখন কোন পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে বসবেন।'

মুশেল থেকে কিছু দূরের পাহাড়ী এলাকা। শহরের কাছে হলেও সেখানে কোন জনবসিত নেই। সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড় আর টিলার সমাহার। সেইসব টিলার ফাঁকে ছোট বড় খোলা প্রান্তর। তেমনি প্রান্তরের মাঝে হঠাৎ কোথাও দু একটি কুটির চোখে পড়ে। ওতে বাস করে কোন পাহাড়ী পরিবার। তেমনি একটি প্রান্তর।

প্রান্তরটি বেশ সবুজ শ্যামল। পাহাড়ী রাখালরা সেখানে মেষ ও উট চরাতো। একদিন রাখালদেরকে সেই প্রান্তরে আসতে নিষেধ করে দিল একদল সৈনিক। এই প্রান্তরের পাশ দিয়ে যাতে কোন লোক চলাচল করতে না পারে সে জন্য মুশেলের সৈন্যরা সেখানে পাহারা বসালো। কোন পাহাড়ীও যাতে সে পথে পা না বাড়ায় সে জন্য তাদের বলা হলো দূর দিয়ে যাতায়াত করতে।

মুশেলের সৈন্যরা সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। পাহাড়ী রাখাল ও লোকজন দেখলো, সেই সৈন্যদের সাথে আরো কিছু লোক আছে যাদের পোশাক ভিন্ন। তাদের সাথে বাইরের অজানা এই লোকগুলো কারা চিনতে পারলো না তারা।

পাহাড়ী এলাকার সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ওদের যাতায়াত নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের মধ্যে জাগলো কৌতুহল। সেখানে কি ঘটে জানার জন্য তাদের আগ্রহের কোন কমতি নেই। বরং নিষেধাজ্ঞার ফলে ওইসব পাহাড়ীদের আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠলো সেই প্রান্তর।

সে জায়গা সম্পর্কে অদ্ভূত অদ্ভূত কথা শুনতে লাগলো তারা। শোনা গেল, সেখানে এক দরবেশ এসেছেন। তিনি মুশেলবাসীর ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবেন।

এ কথাও সকলের মুখে মুখে গুজবের মত ফিরতে লাগলো যে, দরবেশ আকাশ থেকে কোন এক নিদর্শন দেখতে পাবেন। তারপর তিনি মুশেলবাসীদের জন্য দোয়া করবেন। তার দোয়া নিয়ে যখন মুশেলের সৈন্যরা পথে নামবে তখন তাদের চলার পথের সব বাঁধা দূর হয়ে যাবে। তাদের সামনে যারাই পড়বে ধ্বংস হয়ে যাবে তারা। এভাবেই মুশেলবাসী একদিন অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহী পেয়ে যাবে।

মুশেল শহরেও এসব গুজব সমানে চলছিল। যেখানেই দু'চারজন লোক সমাগম হয় সেখানেই তাদের আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় দরবেশের কেরামতির কাহিনী।

একদিন এক রাস্তার মোড়ে চারজন লোক বসেছিল। তাদের মাঝেও দরবেশের অদ্ভূত ক্ষমতা নিয়ে কথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল হাসান ইদরিস।

হাসান ইদরিস সুলতান আইয়ুবীর সেই গোয়েন্দা যে বৈরুত থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের দুত এহতেশামুদ্দিন ও তার নর্তকী কন্যা সায়েরাকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে এসেছিল। তার এই তুলনাহীন সফলতায় সুলতান খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে বড় ধরনের অবদান রাখার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

এহতেশামুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীকে জানিয়েছিলেন, খৃষ্টানরা মুশেলের কাছে কোন এক পাহাড়ের গহ্বরে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রীর বিরাট ভান্ডার গড়ে তুলেছে। মুশেলের সেই পাহাড়কেই তারা তাদের কমান্ডো বাহিনীরও আখড়া বানিয়েছে। এতে সুলতান আইয়ুবীর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা পাহাড়ী এলাকায় তাদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। তিনি এই সত্যও উপলব্ধি করতে পারলেন, যুদ্ধের আগেই যে সৈন্য বাহিনী প্রতিপক্ষের অস্ত্র ও রসদপত্র হস্তগত করতে পারে তারা অর্ধেক যুদ্ধ আগেই জয় করে নেয়।

এ জন্যই সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনী সব সময় খৃস্টানদের অজ্ঞাতে তাদের অস্ত্র ও রসদ ভান্ডারে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তা ধ্বংস করে দিত। সুলতানের কমান্ডো বাহিনীর হাতে বার বার নাজেহাল হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল খৃস্টান সৈন্যদের। তাই খৃস্টান বাহিনী সব সময় এই কমান্ডো আতঙ্কে ভুগতো।

সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধের কিছু বিশেষ কৌশল ছিল। তিনি সব সময় মরুভূমির পানির উৎসগুলো নিজ অধিকারে রাখতেন। ঘাস ও চারণভূমিগুলোও নিজ অধিকারে রাখতেন। তার কমান্ডো বাহিনী খৃস্টানদের অস্ত্র ও রসদের ভান্ডার ধ্বংস করে দিত। এমনকি পশুর খাবারও নষ্ট করে ফেলতো যাতে তাদের ঘোড়া ও উটগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ছাড়া যুদ্ধের জন্য তিনি সব সময় উঁচু স্থান বেছে নিতেন যাতে তার তীরন্দাজ বাহিনী পাহাড়ের চুড়ায় বসে সহজেই দুশমনকে টার্গেট বানাতে পারে।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর গোয়েন্দা প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহকে বললেন, 'খৃষ্টান কমান্ডোরা কোথায় আস্তানা গেড়েছে তা খুঁজে বের করো।' এরপর তিনি তার কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সালেম মিশরীকে বললেন, 'তাদের আস্তানা ও রসদ ভান্ডারের সন্ধান পেলে সাথে সাথে সেগুলো হস্তগত করবে অথবা ধ্বংস করে দেবে।'

সুলতান আইয়ুবী বুঝতে পারছিলেন, খৃস্টানরা আরেকটি সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছে। তারা চাচ্ছে তিনি যেন আগে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি তাদের পাতা ফাঁদে পা দিতে চাচ্ছিলেন না।

তিনি এহতেশামুদ্দিনের কাছ থেকে খৃষ্টানদের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, খৃষ্টান বাহিনীকে তিনি কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়ানোর সুযোগ দেবেন না। আবার নিয়মিত যুদ্ধের সূচনাও করবেন না তিনি।

সুলতান আইয়ুবী তার কমান্ডো বাহিনীকে তৎপর হতে হুকুম দিয়ে বললেন, 'মুশেলের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ো এবং খোঁজ নাও কোথায় দুশমন আত্মগোপন করে আছে। খোঁজ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের ওপর কমান্ডো হামলা চালাবে এবং ঝটিকা অভিযান চালিয়ে তাদের তছনছ করে দিয়ে মুহূর্তে আবার তাদের দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

এরপর তিনি তার নিয়মিত বাহিনীকে আদেশ করলেন, 'তোমরা সাঞ্জারের দিকে অভিযান চালাও এবং সাঞ্জার দূর্গ অবরোধ করে

নাও।'

সাঞ্জার মুশেল থেকে কিছু দূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ দূর্গ। মুশেলের প্রতিরক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাঞ্জার। এ কেল্লার অধিপতি ছিলেন শারফুদ্দিন বিন কুতুবুদ্দিন।

একটু আগে সুলতান আইয়ুবী তাঁর সেনাপতিদের বলেছিলেন, 'এখন আমি আর কারো সাহায্য সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাবো না বরং তলোয়ারের খোঁচায় তাদের সাহায্য আদায় করে নেবো।' সাঞ্জার দূর্গ অবরোধ এই সংকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ।

তিনি জানতেন, এসব ছোট ছোট মুসলমান আমীররা স্বাধীন থাকার জন্য খুবই লালায়িত। এ জন্য তারা গোপনে খৃষ্টানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আছে।

সাঞ্জারের আমীর শারফুদ্দিন সম্পর্কে সুলতান আইয়ুবী খবর পেলেন, তিনি মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের বন্ধু। তাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি হলো সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সে প্রাচীর গড়ে তুলবে।

হাসান বিন আবদুল্লাহ তাঁর গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন। মুশেলে তার গোয়েন্দা অনেকেই আছে। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন, খৃষ্টানদের রসদ ভান্ডারের খোঁজ পেতে হলে তাকে একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাহসী গোয়েন্দাকে বৈরুত পাঠাতে হবে। এদিকে যখন খৃস্টান কমান্ডোদের অনুসন্ধান চলবে তখন সে চেষ্টা করবে তারা কোথায় আছে সে খবর বৈরুত থেকে সংগ্রহ করতে। তিনি হাসান ইদরিসকে এ জন্য বাছাই

করলেন।

তখনি তার মনে হলো, এটা ঠিক হবে না। সে দীর্ঘদিন বৈরুতে ছিল, আবার ফিরে গেলে খৃস্টান গোয়েন্দারা তাকে চিনে ফেলতে পারে।

হাসান ইদরিস ছিল গুপ্ত বেশ ধারণে ওস্তাদ। বেশভূষার সাথে সাথে সে নিজের কণ্ঠও বদলে ফেলতে পারতো। হাসান বিন আবদুল্লাহর অভিপ্রায় এবং তা পাল্টে ফেলার কথা জানতে পেরে সে হাসান বিন আবদুল্লাহকে বললো, 'আপনি আমাকে নির্দ্ধিধায় বৈরুত পাঠাতে পারেন। আমি বৈরুত ফিরে গিয়ে এমন বহুরূপ ধারণ করবো যে, পরিচিত লোকও আমাকে চিনতে পারবে না।'

কিন্তু হাসান বিন আবদুল্লাহ এই ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন না। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি বরং মুশেল যাও। ওখানে কেউ তোমাকে চেনে না। তুমি মুশেল থেকেই গোপন তথ্য বের করার চেষ্টা করো।'

হাসান ইদরিস মুশেল রওনা হলে সুলতান আইয়ুবী তাকে ডাকলেন এবং নিজে তাকে আরো কিছু উপদেশ দিলেন যাতে সে দ্রুত সাফল্য বয়ে আনতে পারে। তিনি তাকে বললেন, 'হে প্রিয় বন্ধু! মনে রাখবে, ইতিহাস সব সময় সুলতান আইয়ুবীর নাম মনে রাখবে। পরাজিত হলে ইতিহাস আমাকে লজ্জা দেবে এবং একজন ব্যর্থ সেনানায়ক বলে তিরষ্কার করবে। আর যদি বিজয় লাভ করি বা শহীদ হই, তবে লোকে আমার কবরে ফুল ছিটাবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম আমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে

আমাকে স্মরণ করবে গর্ব ভরে। কিন্তু এটা খুবই অন্যায়।'

তিনি হাসান ইদরিসকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বিজয় মাল্য তো তোমাদের প্রাপ্য। প্রাপ্য তোমার সেইসব সঙ্গী সাথীদের, যারা শত্রুর দূর্গের ভেতর থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। এ তথ্যই তো আমাদের বিজয়ের পথকে সুগম করে। ইদরিস, দুনিয়া কিভাবে কাকে মূল্যায়ন করবে এটা বড় কথা নয়। আল্লাহ্ সব দেখছেন। তিনি জানেন এই বিজয়ের পেছনে কার অবদান কতটুকু। আমি বিশ্বাস করি, কাল কেয়ামতের মাঠে তোমাদের মাথায় আল্লাহ নিজ হাতে বিজয় মুকুট পরিয়ে দেবেন।

আমি যদি পরাজিত হই তবে তা ঘটবে আমার ভুলের কারণে। হয়তো দেখা যাবে তোমাদের সংবাদকে আমি যেভাবে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল সেভাবে দিতে পারিনি। কিন্তু যদি জয়লাভ করি সে জয় হবে তোমাদের। কারণ আমার কান ও চোখ তোমরা।'

তিনি খানিক থামলেন। একটু পর হাসান ইদরিসের দিকে তাকিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তবু আমার আত্মা তোমাদের কবরের উপর ফাতেহা পাঠ করতে থাকবে। আমার আত্মা তোমাদের জন্য প্রতিনিয়ত মাগফেরাত কামনা করতে থাকবে। কারণ তোমরাই জাতির মহান বীর। মনে রেখো, একটি সমৃদ্ধ গোয়েন্দা বিভাগ সেই জাতির গৌরব ও গর্বের ধন।'

তিনি বললেন, 'দেখো, এ যুদ্ধে প্রকৃত অর্থে আমার কোন

শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আমি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সাঞ্জার অভিযানে যাচ্ছি। আর তুমি? তুমি একা সেখানে যাচ্ছো যেখানে চারপাশে কিলবিল করছে তোমার দুশমন। আমি যদি বিজয়ী হই তা হবো আমার বাহিনীর জন্য, আর তুমি বিজয়ী হবে একা। তাহলে বলো, কার মর্যাদা বেশী হওয়া উচিত? যাও প্রিয় বন্ধু, তুমি যাও, আল্লাহ হাফেজ।

সূর্য ডুবেছে একটু আগে। হাসান ইদরিস এক গরীব মুসাফিরের বেশে নসিবা ক্যাম্প ত্যাগ করলো। সঙ্গে শুধু নিজের বাহন উটটি, আর কোন সঙ্গী নেই।

অন্ধকার রাত। একাকী পথ চলছে হাসান ইদরিস। ভাবছে দায়িত্বের কথা। সুলতান আইয়ুবীর শেষ কথাগুলো এখনো তার কানে বাজছে। উট চলছে ধীর গতিতে।

নসিবা থেকে বহু দূরে চলে এসেছে সে। রাতও গড়িয়ে গেছে অনেক। ঘুম ঘুম একটা ভাব পেয়ে বসেছে তাকে। এ সময় অসংখ্য ঘোড়ার মৃদু পদধ্বনি শুনতে পেলো সে। অনেক দূর দিয়ে কোন কাফেলা যাচ্ছে।

এত রাতে কারা যায়? কারা এ ঘোড়ার আরোহী? সুলতান আইয়ুবী কি স্বসৈন্যে সাঞ্জার দূর্গ অবরোধ করতে যাচ্ছেন? কান পেতে সে শুনলো ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ। এক সময় মিলিয়ে গেল সে ধ্বনি।

সুলতান আইয়ুবী নসিবা থেকে তার ক্যাম্প উঠিয়ে নেননি। নসিবায় অবস্থিত তার হেডকোয়ার্টারে কিছু সৈন্য ও অফিসার

এবং সেই সাথে তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে সেখানে প্রস্তুত অবস্থায় রেখে তিনি নসিবা ত্যাগ করলেন।

এক সময় মুশেল এসে পৌঁছলো হাসান ইদরিস। সোজা গিয়ে রিপোর্ট করলো মুশেলের গোয়েন্দা কমান্ডারের কাছে।

'তুমি এখানে জানতে এসেছো, খৃষ্টানরা তাদের সৈন্য, খাদ্য ও অস্ত্রসম্ভার পাহাড়ের কোন গুহায় লুকিয়ে রেখেছে?' মুশেলের গোয়েন্দা কমান্ডার বললো, 'আমরাও তো এখানে এ তথ্য জানার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু চেষ্টা তো সফল হতে হবে। সুলতান এ তথ্য জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। কোন সূত্রই কি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেননি?'

'জানি না এ সূত্র কোন কাজ দেবে কিনা? এখানে এক দরবেশের আবির্ভাব হয়েছে। এতদিন তিনি শহরের কাছে এক কুটিরে বাস করতেন। এর মধ্যে এক ঘটনা ঘটলো।

একদিন দরবেশ মুশেলের শাসক ইয়াজুদ্দিন মাসুদের মহলে গিয়ে তার সাথে দেখা করলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতবাণী করে বলেছেন, 'মুশেলবাসীরা একদিন অর্ধ পৃথিবীর শাসক হবে। অগাধ সম্পদের মালিক হবে।'

তিনি আরো বলেছেন, তিনি তাদের জন্য দোয়া করবেন। একদিন আকাশ থেকে তিনি ইশারা পাবেন। তখন তিনি মুশেলের ফৌজকে অভিযানের জন্য বলবেন। তার দোয়া নিয়ে

মুশেলের ফৌজ যখন ময়দানে নামবে তখন পথের সমস্ত বাঁধা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।'

'বলেন কি!' হাসান ইদরিস অবাক হয়ে বললো, 'এ লোক তো দরবেশ নয়। এ লোক খৃস্টানদের গোয়েন্দা। তাকে পাকড়াও করতে পারলেই খৃস্টান কমান্ডোদের হদিস বের করা সম্ভব।'

'কিন্তু এ লোক তো এখন হাতের নাগালের বাইরে। পাহাড়ের কোথায় গিয়ে তিনি আসন নিয়েছেন জানা নেই আমাদের। তিনি পাহাড়ে আসন নেয়ার পর থেকে সৈন্যরা সে এলাকাটা ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে কারো চলাচলের অনুমতি নেই। এমনকি পাহাড়ী উপজাতিদেরও সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানকার চারণভূমিতে পশু চরাবার অনুমতিও নেই রাখালদের।'

'দরবেশের নিরাপত্তার জন্য কারা পাহারা বসিয়েছে, মুশেলের সেনাবাহিনী?'

'হ্যাঁ, তবে তাদের সাথে কিছু অচেনা মানুষও আছে। তারা কাউকে পাহাড়ে চড়তে দিচ্ছে না। এমন কি পাহাড়ের আশপাশেও ভিড়তে দিচ্ছে না।'

'এখানে তার ভক্তের সংখ্যা কেমন?'

'অনেক। কেউ কেউ তাকে ইমাম মেহেদী মনে করে। কেউ কেউ তাকে হযরত ঈসা (আ.) ভাবে। তাদের ধারনা, হযরত ঈসা (আ.) মুশেলবাসীর দুঃখ দূর করার জন্য আবার পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।'

কমান্ডার হাসান ইদরিসকে আরো বললো, 'এই দরবেশের

সুখ্যাতি শহর ও তার আশপাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একজন পবিত্র ও কামেল লোক এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের মনে কোন সন্দেহ নেই। রাতের বেলা শহরের লোকেরা বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কোন তারকা ছিটকে পড়লে তারা চিৎকার দিয়ে উঠে 'এই সেই ইশারা।' এভাবে লোকজন আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভুলতে বসেছে।'

ওরা চারজনই আইয়ুবীর গোয়েন্দা। বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে দরবেশের মুখোশ খোলার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে আত্মপূজা হারাম। মুশেলবাসীর মন মগজ যখন দরবেশ আচ্ছন্ন করে নিয়েছে তখন এই চার গোয়েন্দা দরবেশের মুখোশ খোলার কাজে লিপ্ত হলো।

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ। আমার কথা যদি হেসে উড়িয়ে না দাও তবে বলি।' হাসান ইদরিস বললো, 'যেখানে দরবেশ আছে সেখানেই খৃষ্টানদের রণসম্ভার ও রসদ আছে। আর এটা কোন তুচ্ছ ভান্ডার হতে পারে না।

এমনিতেই জনসাধারণকে সরিয়ে তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে দরবেশ তার আখড়া তৈরী করেনি। আমার বিশ্বাস, এতবড় বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকায় যতই সৈন্যই পাহারায় বসানো হোক না কেন, ভেতরে যাওয়ার সুযোগ অবশ্যই সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষ এই ভয়ে সেখানে যায় না, ওখানে আল্লাহর এক দরবেশ বসে আছেন। তিনি চান না, তার আশেপাশে কেউ

যাক। তাই লোকজন সেদিকে তাকানোর সাহস পায় না।'

কমান্ডার হাসান ইদরিসকে বললো, 'তুমি কি শোননি চারদিকে কি গুজব রটিয়ে দেয়া হয়েছে? যে ব্যক্তি সে এলাকায় যাবে এবং দরবেশকে দেখার দুঃসাহস করবে, সে লুলো হয়ে যাবে, তার সন্তানদের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।'

হাসান ইদরিসের অন্য সাথী বললো, 'খৃষ্টানরা সেখানে অস্ত্রের গোপন ঘাঁটি গড়ে তুলেছে এতে আমাদেরও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাই না করে এ তথ্য আইয়ুবীর কাছে পাঠানোর কোন মানে হয় না। আমাদের জানা দরকার সেখানে কি আছে এবং তার পরিমাণ কেমন? সেখানে কি কেবল অস্ত্রই আছে নাকি সৈন্যও মজুদ করেছে খৃষ্টানরা? এখন বলো, এ তথ্য উদ্ধারের জন্য আমরা কি করতে পারি? দরবেশ যে খৃষ্টানদের একটা সাজানো কাভার তোমার মত আমরাও তা বুঝতে পারছি?'

'শুধু তথ্য আদায় নয় দরবেশকে তার সম্পদসহ ধ্বংস করতে হবে।' হাসান ইদরিস বললো।

'শুধু দরবেশকে ধ্বংস করলেই চলবে না, জনগণকেও বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। দরবেশের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে এ লোক কোন পীর নয়, পীরের বেশ ধরে আছে মাত্র।' অন্য সঙ্গী বললো।

গোয়েন্দা কমান্ডার বললো, 'খৃষ্টানদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। তারা শুধুমাত্র একজন দরবেশকে সেখানে বসিয়েই তাদের অস্ত্র ও রসদসম্ভার জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে

সক্ষম হয়েছে। আর সেই দরবেশ মুশেলের জনগণকে আল্লাহর ইশারার কথা বলে তাদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। মনে হয় মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনও ছলনার শিকার। আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় মুসলমানদের বসিয়ে রেখে তারা প্রস্তুতি পূর্ণ করছে।'

'দরবেশ সম্পর্কে মুশেলের আমীরের ধারণা কি?' হাসান ইদরিস প্রশ্ন করলো।

'দরবেশ যখন তাঁর মহলে গিয়েছিল তখন তাকে স্বসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ইয়াজউদ্দিনের মহলের রক্ষীরা।' কমান্ডার প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'আর দরবেশ যখন বেরিয়ে আসে, তখন ইয়াজউদ্দিন তার ছয় ঘোড়ার শাহী পালকি দিয়েছিল দরবেশকে পৌঁছে দিতে। সেই গাড়ীতে করেই তিনি পাহাড়ী এলাকায় যান এবং সেখানে আস্তানা গাড়েন। এতেই প্রমাণ হয়, ইয়াজউদ্দিনও এই ষড়যন্ত্রের সাথে লিপ্ত।'

'কিন্তু ষড়যন্ত্রটা কোন পর্যায়ের তা কিন্তু এতে পরিষ্কার হলো না। দরবেশ ও ইয়াজউদ্দিনের মধ্যে কি নিয়ে আলাপ হয়েছে তা জানা দরকার ছিল।'

'তারও ব্যবস্থা করা যাবে।' কমান্ডার বললো, 'যা কিছুই ঘটুক আমরা তা জানতে পারবো। মহলে রাজিয়া খাতুন আছেন। তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন মহলের ভেতর। তার কাছ থেকেই জানা যাবে মহলে দরবেশ কেমন খাতির যত্ন পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কি নিয়ে আলাপ হয়েছিল।'

এরা সে এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা শুরু করলো। গোয়েন্দা

তৎপরতা ছড়িয়ে দিল পাহাড়, শহর এবং শহরতলী সংলগ্ন দরবেশের সেই কুটিরের আশপাশ পর্যন্ত।

সাঞ্জার দুর্গের প্রাচীরের উপর প্রহরীরা অলসভাবে পাহারা দিচ্ছিল। যুগটা যুদ্ধের হলেও ওদের জন্য সময়টা ছিল শান্তির। কোন রকম বিপদ বা ঝুঁকির আশংকা না থাকায় পাহারায় কোন সতর্কতা ছিল না।

তাদের এ নিশ্চিন্ততার কারণ, সাঞ্জারের আমীর শারফুদ্দিন খৃষ্টানদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই খৃস্টানরা তার ওপর কোন আক্রমণ করবে না, এটা জানা কথা। এছাড়া তাদের জানা আছে, পার্শ্ববর্তী হলবের আমীর ইমাদুদ্দিন ও মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনও খৃস্টানদের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে। তারা তাকে এ আশ্বাসও দিয়েছে, বিপদের সময় তারা একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ফলে প্রতিবেশী দুই অঞ্চলের সাথে এখন তার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যাচ্ছে। এ অবস্থায় তার ভয়ের কোন কারণ নেই। এ জন্যই শারফুদ্দিন ও তার সৈন্যরা ছিল নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত। তারা কল্পনাও করেনি, সুলতান আইয়ুবী কখনো তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারেন।

মধ্য রাত পেরিয়ে গেছে। মানুষ ঘুমিয়ে আছে শান্তির কোলে। কিন্তু যাদের হাতে সম্পদের পাহাড় জমে যায় তারা অত সহজে ঘুমাতে পারে না। ভোগের তৃষ্ণা তাদের ঘুম ঘুম চোখগুলোকে যেন কিছুতেই ঘুমোতে দেয় না। তাই ঘুম এলেও ঘুমোতে

পারছিল না শারফুদ্দিন। শরাবের নেশায় মাতাল অবস্থায় ঢুলছিল সে। খৃষ্টানরা তাকে দুটি সুন্দরী মেয়ে উপহার পাঠিয়েছিল, তারা তখনো তার হাতে তুলে দিচ্ছিল শরাবের পাত্র।
কেল্লার উপর দিয়ে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তীর বেগে ছুটে গেল। একটু পরেই আরো একটা। প্রহরীরা বিস্মিত হলো। তখনো তারা ধারনাই করতে পারেনি, কেউ তাদের আক্রমণ করেছে। রহস্যময় স্ফুলিঙ্গের উড়াউড়ি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদের চাহনি বলছিল, 'কি অবাক কান্ডরে বাবা! ভূতের পাল্লায় পড়লাম নাকি?'
কেল্লার প্রহরীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে এ নিয়েই কথা বলছিল। তাদের সবার মুখেই ভয় ও আতংকের স্পষ্ট ছাপ। তারা যেদিক থেকে স্ফুলিঙ্গ দুটো ছুটে এসেছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কিছু দেখা যায় কিনা। কিন্তু নাহ, সবকিছুই সুনসান, নিরব, নিস্তব্ধ।
হঠাৎ সবাইকে ভড়কে দিয়ে আরো একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে এলো এবং সেটি তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দূর্গের ভেতরে পড়লো। স্ফুলিঙ্গটি উড়ে গিয়ে এমন জায়গায় পড়লো যেখানে পশুর শুকনো খাবার গাদা করে রাখা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো।
গাদার পাশেই ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। দেখতে দেখতে সেই আগুন কাঠের তৈরী আস্তাবল স্পর্শ করলো এবং মুহূর্তে সেই আস্তাবল অগ্নিকুন্ডে পরিণত হলো।
একই সারিতে বেশ কয়েকটি আস্তাবল ছিল। প্রথম আস্তাবলটি

পুড়ে দ্বিতীয়টিতেও আগুন লেগে গেল। সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা মেনজানিক দিয়ে পেট্রোলমাখা সলতের মুখে আগুন জ্বালিয়ে নিক্ষেপ করেছিল এই অগ্নিপিন্ড। ফলে মাটিতে পড়েই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমে দুটি অগ্নি তীর ছোঁড়া হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে। ফলে সেগুলো মাটিতে পড়ার আগেই নিভে গিয়েছিল। সে জন্য কেল্লার সৈন্যরা বুঝতে পারেনি কি ঘটছে। কিন্তু কেল্লাতে আগুন লাগার পর ওরা বুঝতে পারে তারা যে কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কারা আক্রমণ করতে পারে? অনেক ভেবেও তারা এ প্রশ্নের সদুত্তর পেলো না।

কেল্লায় ততোক্ষণে কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। দূর্গের ভেতর এতোক্ষণ যে অন্ধকার দানা বেঁধে ছিল সেখানে আলোর নাচন শুরু হয়ে গেল। পাহারাদারদের হাক ডাক ও চিৎকারে জেগে উঠলো ঘুমন্ত সৈন্যরা।

কেল্লার অধিপতি শরাফুদ্দিনকে জাগানো হলো। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়েই দেখতে পেলেন আগুনের লেলিহান শিখা। অভাবিত ধ্বংসের তান্ডব দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ছুটে এলেন।

শারফুদ্দিন ছিলেন সাহসী ও বীর সেনাপতি। কিন্তু সে রাতে খৃষ্টানদের পাঠানো মদ ও মেয়ে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল যে তিনি ঠিকমত পা উঠাতে পারছিলেন না। মরুভূমির কঙ্করময় পাহাড়ী এলাকায় ক্লান্তিহীন যুদ্ধের বীর

সেনাপতি শারফুদ্দিন তখন এক অক্ষম ব্যক্তির মত পা টেনে টেনে ছুটছেন। তার মাথার চিন্তা তখনো এলোমেলো। তিনি কি নির্দেশ দেবেন যেন নিজেই জানেন না।

ডিউটিরত এক কমান্ডার পাঁচিলের ওপর থেকে দৌড়ে নেমে এসে তার মুখোমুখি হয়ে বললো, 'দূর্গ আক্রান্ত হয়েছে। আমরা এখন অবরোধের মাঝে পড়ে আছি।'

'কোন হতভাগা আমার এ দুর্ভেদ্য দূর্গ অবরোধ করেছে?' শারফুদ্দিন বেশ তেজের সাথেই কথাটা বললেন।

'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।' কমান্ডার উত্তর দিল, 'বাইরে থেকে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, কেল্লার দরজা খুলে দাও, নইলে সমস্ত দূর্গ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হবে।'

সুলতান আইয়ুবীর নাম শোনা মাত্র শারফুদ্দিনের নেশা কেটে গেল। এ অবস্থায় কি করবেন তিনি ভেবে পেলেন না।

কতক্ষণ চুপ থেকে কমান্ডারকে বললেন, 'দরজা খুলে দাও। আমি নিজেই বাইরে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবো।'

কিছুক্ষণ পর। কেল্লার ফটক খুলে দেয়া হলো। শারফুদ্দিন সামরিক পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তার সাথে মশালবাহী সেন্ট্রি।

সুলতান আইয়ুবী তার এক সেনাপতিকে বললেন, 'যাও, এগিয়ে গিয়ে তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।'

শারফুদ্দিন নিজেই সুলতানের বাহিনীর দিকে এগুচ্ছিলেন। আইয়ুবীর কমান্ডার এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলো।

সুলতান আইয়ুবী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি শারফুদ্দিনকে অভ্যর্থনার জন্য এক পাও সামনে অগ্রসর হলেন না।

শারফুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর কাছে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামলেন এবং পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সুলতানের দিকে এগিয়ে গেলেন তাকে আলিঙ্গন করতে। সুলতান আইয়ুবী নিরাসক্ত মন নিয়ে আবেগহীনভাবে তার সাথে মুছাফেহা করলেন।

'শারফুদ্দিন!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তোমার সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া কেল্লাতে যা কিছু আছে তা নিয়ে যাও। সকালের সূর্য উঠার আগেই সব কিছু নিয়ে এখান থেকে সরে যাও তুমি, আর কোন দিন এদিকে আসবে না।'

তিনি তাঁর এক সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, 'কিছু সৈন্য নিয়ে কেল্লার ভেতরে যাও। লক্ষ্য রাখবে, কেল্লা থেকে সৈন্য ও কোন অস্ত্রশস্ত্র যেন বাইরে না যায়। এ ছাড়া কেল্লায় রক্ষিত সোনাদানা ও মূল্যবান যা কিছু শারফুদ্দিন নিতে চায় নিতে দাও।'

তিনি তাকে আরো বললেন, 'কেল্লায় কত সৈন্য আছে গণনা করো এবং তাদের মধ্যে যারা আমাদের সাথে শামিল হতে চায় তাদেরকে নিজের সৈন্যদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। আর যারা আমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবে না তাদের আলাদা করে এক জায়গায় জড়ো করে। ওদের ব্যাপারে আমি পরে আমার ফায়সালা জানাচ্ছি।'

'আমি আপনার গোলাম, সুলতান।' শারফুদ্দিন বললেন, 'কেল্লা ও সৈন্য আপনার থাকবে, আমাকেও আপনি আপনার বাহিনীতে শামিল করে নিন এবং আমাকে এ কেল্লায় আপনার এক অনুগত সৈন্য হিসাবে থাকার সুযোগ দিন।'

'তোমার যদি কেল্লারই দরকার হতো তবে বাঁধা দিতে, যুদ্ধ করতে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তোমার মত কাপুরুষ ও বেঈমানের এত বড় কেল্লার দায়িত্বে থাকা উচিত নয়।'

'মাননীয় সুলতান! আমি কি আপনার সাথে মোকাবেলা করতে পারি?' শারফুদ্দিন বললেন, 'আমি যখন শুনলাম, আপনি এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি বাইরে চলে এসেছি। মুসলমানের বিরুদ্ধে কিভাবে আমি অস্ত্র হাতে নেই?'

'যেমন করে আগে হাতে নিয়েছিলে!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'শারফুদ্দিন, আমার সাথে আর প্রতারণা করার চেষ্টা করো না। আমি জানি তুমি খৃষ্টানদের বন্ধু! শুধু নামে মুসলমান হলেই কেউ ইসলামের বন্ধু হয় না। স্বার্থের টানে যারা আপন ধর্ম ও জাতির বুকে ছুরি চালাতে পারে তুমি তো তাদেরই একজন।

তোমার চোখে এখন খৃস্টানদের দেয়া রঙিন চশমা। তাই নিজের চেহারা তুমি দেখতে পাচ্ছো না। তুমি ছিলে এ জাতির এক বীর সেনানী। কিন্তু ঈমান বিক্রি করে যেদিন তুমি বিলাসিতা ও আমোদ ফুর্তি কিনে নিয়েছো সেদিন থেকেই তুমি আমড়া কাঠের ঢেকিতে পরিণত হয়েছো। মদ ও নারী তোমার মধ্যের সব শক্তি শুষে নিয়েছে। লড়াই করার হিম্মত এখন তুমি

কোথায় পাবে?
তুমি মিথ্যা বলছো, লড়াই করার সাহস নেই বলেই তুমি এখন কাপুরুষের মত হাতিয়ার সমর্পন করেছো। যদি তোমার মধ্যে সামান্য ব্যক্তিত্ব ও লজ্জাবোধ থাকতো তবে বিনা যুদ্ধে তুমি আমার হাতে এ কেল্লা তুলে দিতে না।'
'মহামান্য সুলতান!' শারফুদ্দিন বিগলিত কণ্ঠে অনুনয় করে বললো, 'আমি কেল্লার কর্তৃত্ব চাই না, আমাকে শুধু দয়া করে এ কেল্লায় থাকতে দিন।'
সুলতান আইয়ুবী তাঁর এক সেনাপতিকে বললেন, 'একে কেল্লার মধ্যে নিয়ে যাও এবং বন্দী করে রাখো। এতেই তার আশা পূরণ হবে।'
তিন চারজন সৈন্য এগিয়ে গেল শারফুদ্দিনের দিকে। শারফুদ্দিন বন্দী হওয়ার কথা শুনে সুলতান আইয়ুবী দিকে দু'কদম এগিয়ে করজোড়ে বললেন, 'আমার ওপর রহম করুন সুলতান। আমাকে অন্তত মুশেল যাওয়ার অনুমতি দিন।'
'হ্যাঁ, ইয়াজউদ্দিন তোমার বন্ধু!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'সেখানে যাওয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। যাও, আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম, তুমি সেখানেই চলে যাও।'

সাঞ্জার দূর্গ সুলতান আইয়ুবীর পূর্ণ দখলে চলে এলো। তিনি তকিউদ্দিনকে কেল্লার অধিপতি করে তাকে কেল্লা বুঝে নেয়ার হুকুম দিলেন।
সাঞ্জার দূর্গের কাছেই আরো একটি কেল্লা ছিল। তিনি শেষ

রাতের দিকে সে কেল্লা অবরোধ করার কথা মনে মনে চিন্তা করে রাতের অবশিষ্ট অংশ সাঞ্জার দুর্গেই কাটালেন।

রাত তখনো শেষ হয়নি। তখনো অন্ধকার লেপ্টে ছিল পৃথিবীর শরীরে। তিনি তকিউদ্দিনের বাহিনী বাদে অবশিষ্ট সৈন্যদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো ক্লান্ত মুজাহিদরা। বিজয়ের আনন্দ তাদের সব ক্লান্তি মুছে দিয়েছিল। নতুন বিজয়ের পুলক শিহরণ তাদের জোগাচ্ছিল উদ্দাম প্রাণাবেগ।

এলাকাটার নাম আমিদা। এটা দজলা নদীর পারের এক প্রসিদ্ধ জনবসতি। এ জনবসতির সরদার মুসলমান হলেও পার্শবর্তী অন্যান্য আমীরদের মত সেও গোপনে খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এই জনপদের নিরাপত্তার জন্যই সে ওখানে গড়ে তুলেছিল একটা দূর্গ।

সুলতান আইয়ুবী দূর্গটি অবরোধ করে নিলেন। দূর্গের সৈন্যরা মোকাবেলা করার চেষ্টা করলো। স্থানীয় জনগণও প্রবল বিক্রমে এগিয়ে গেল সৈন্যদের সাহায্যে। এটাকে তারা নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করলো। বাধ্য হয়ে সুলতানকে অবরোধ দীর্ঘ করতে হলো।

তিনি চাইলে প্রবল আক্রমণ করে সহজেই দূর্গটি দখল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তাতে লোক ক্ষয় হতো। তিনি যথাসম্ভব কম রক্তক্ষয় করে জয়ী হতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি অবরোধ দীর্ঘায়িত করলেন।

অষ্টম দিনে সরদার অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য হলেন। সুলতান

আইয়ুবী সে এলাকা ও দুর্গের অধিপতি নিয়োগ করলেন কারার সুলতানের পুত্র নুরুদ্দিনকে।

রায়াদী চারজন খৃস্টান সেনার অধীনে পথ চলছিল। নিয়মিত অষুধ সেবনের ফলে তার জখম ভাল হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টানরা তার আরাম আয়েশের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিল। কিন্তু যে রাতে সে তার জীবন কাহিনী পাহারাদারদের কাছে খুলে বললো এবং তাদের কাছে তার উদ্দেশ্য ও সংকল্প স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলো সে দিন থেকে তারা তাদের ব্যবহার পাল্টে ফেললো।

এখন তারা আর আগের মত তার সাথে খোলামেলা কথা বলে না। তারা তার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। রায়াদী বুঝতে পারে সে চোখের ভাষা। সেখানে খেলা করছে লোভ, মুগ্ধতা ও সন্দেহ।

রায়াদীও নিজেকে গুটিয়ে নিল। সেও তাদের সাথে খাতির জমানোর চিন্তা বাদ দিয়ে আপন মনে বিভোর হয়ে গেল। খৃষ্টান সৈন্যদের বলা সেই বাক্যগুলো বার বার তার কানে বাজতে লাগলো, 'তোমাকে খোদাই তিরস্কৃত ও বহিস্কৃত করেছে। কোন সওয়াবের কাজ তো তুমি করোনি যে আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।'

যখনই তার এ কথা মনে হতো তখনই তার অস্থিরতা বেড়ে যেতো। শারিরীক অবস্থা ভাল থাকলেও এই কারণে তার মনের আবেগ ছিল বড়ই উদ্বেগময়। তার মনে পড়ে যেতো তার

স্বপ্নের রাজকুমারের কথা। যে লোক তাকে পবিত্র করার জন্য হজ্জে নিয়ে যাচ্ছিল। তার কথা স্মরণ হলেই অস্থিরতা পেয়ে বসতো রায়াদীকে। হায়, হেজাজের কাফেলা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আর সেই সাথে হারিয়ে গেছে তার স্বপ্নের রাজকুমার।
যখন সে খুব অধীর হয় উঠতো তখন সে ভাবতো, আল্লাহ তার পাপের শাস্তিই তাকে দান করছেন। কিন্তু কি করে এ পাপের ক্ষমা পাওয়া যায় তা যে তার জানা নেই।
রায়াদীকে নিয়ে চার রক্ষী তাদের গন্তব্য স্থানের অনেক কাছে চলে এসেছে। তারা এখন মুশেলের এলাকা অতিক্রম করছে। এলাকাটা মুসলিম অধ্যুষিত হলেও তাঁদের মনে এ শান্তনা ছিল, মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিন তাদের বন্ধু।
তারা মুশেলের এলাকায় প্রবেশ করার পর পরই তারা এক উটের আরোহীর সামনে পড়ে গেল। আরোহী তাদের দেখে তার উট থামালো। রক্ষীরা খেয়াল করে দেখলো, তার মাথা ও মুখ কালো পাগড়ীতে ঢাকা। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে নেকাবের ফাঁক দিয়ে। লোকটির দৃষ্টি রায়াদীর উপর জমে আছে।
খৃস্টান সৈন্যরা সামরিক পোষাকে ছিল না, ফলে তাদের দেখে কারো পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না যে এরা খৃষ্টান সৈন্য। তারা সাধারণ মুসাফিরের বেশে পথ চলছিল। চার পুরুষ ও এক নারীর ছোট্ট এক কাফেলা।
'ওই উটের আরোহীর চোখের দৃষ্টি দেখেছো?' এক খৃস্টান রক্ষী তার সাথীকে বললো।

'খুব গভীরভাবে দেখেছি।' সঙ্গের সৈনিকটি জবাব দিল, 'আমি এই দৃষ্টি ভালভাবেই চিনি। এখন আমাদের খুব বেশী সাবধান হতে হবে। এই মেয়েটি এতই সুন্দরী যে, তাকে পাওয়ার জন্য যে কোন ডাকাত বড় রকমের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করবে না। এ চাহনি বলছে, আমরা মরু ঈগলের নজরে পড়ে গেছি।'

ওরা পথ চলছে। পথ চলছে সেই উটের আরোহীও। অভিন্ন পথে যাত্রা ওদের, তাই আরোহীকে তারা বলতে পারছিল না, 'তুমি আমাদের অনুসরণ করছো কেন?' কিন্তু তার চোখ ও চলার গতি বলছিল, এ লোক তাদের অনুসরণ করছে।

কখনো আরোহী তাদের কাছাকাছি হতো আবার কখনো পিছিয়ে পড়তো। এভাবেই তারা সারাদিন পথ চললো। সন্ধ্যার সময় তারা এক পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করলো।

পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করার পর পরই তারা সেই উটের আরোহীকে হারিয়ে ফেললো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো খৃস্টান রক্ষীরা।

রাতে দুই পাহাড়ের মাঝখানে পছন্দ মত জায়গা দেখে তারা ঘোড়া থামালো এবং খানা পিনার ব্যবস্থা করলো। খাওয়া দাওয়া সেরে তার নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো।

নিয়ম মতো এক সিপাই পাহারায় থাকলো বাকীরা ঘুমিয়ে গেল। মাঝ রাতে সে যখন ঘুমাতে যাবে তখন অন্য সঙ্গীকে ডেকে তার হাতে তুলে দেবে পাহারার দায়িত্ব।

সঙ্গীরা ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে গেছে রায়াদী। একা বসে বসে বাড়ীর কথা কল্পনা করছিল সিপাই. এ সময় সে কিসের যেন

শব্দ শুনতে পেল। মনে হলো কোন শিয়াল ছুটে যাচ্ছে বা পাথর গড়িয়ে পড়ছে। সিপাই সতর্ক হয়ে গেল।

সে কান খাঁড়া করে রইলো। আবারও শব্দ শোন গেল। সে সঙ্গী এক সিপাইকে জাগালো এবং তার কানে কানে বললো, 'কিসের যেন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

সঙ্গী উঠে বসলো। সেও শুনতে পেলো পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ। দু'জনই সতর্ক হয়ে ধনুকে তীর জুড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। দুইজন দুই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘন অন্ধকার ভরা রাত। পাহাড়ের খাঁজে অন্ধকার ছিল আরো গাঢ়। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখন আর কোন শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে হঠাৎ পাশেই কোথাও ছাগলের ডাকের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ শোনা গেল। দুই সৈন্যই সচকিত হয়ে সেদিকে তাকালো।

অন্ধকারের মধ্যে এই সামান্য নড়াচড়া কারো নজরে পড়ার কথা নয়, কিন্তু দেখা গেল অকস্মাৎ দুটি তীর দু'জনের পার্শ্বদেশ ভেদ করেছে। তাদের অন্য সাথী দু'জন সারাদিনের ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

তারা দু'জন তীর খেয়ে যখন চিৎকার দিয়ে উঠলো ঘুমন্ত সৈন্যরা জেগে উঠলো সে চিৎকারে। তারা হুড়মুড় করে উঠে বসলো। এ সময় কারো পদধ্বনি শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি মশাল জ্বলে উঠলো। মুহূর্তে সাত আটজন লোক তাদের ঘিরে ফেললো। ওদের মধ্যে একজনের মাথায় পাগড়ী বাঁধা

এবং চেহারা নেকাবে ঢাকা। এ লোককেই ওরা দিনের বেলায় উটের পিঠে দেখেছিল। রায়াদীরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে গভীর দৃষ্টিতে দেখছিল ডাকাতদের।

রক্ষী দু'জনের একজন তলোয়ার টেনে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ সে পেল না। সাত আটটি বর্শা তার ও তার সাথীর দেহকে ঝাঁঝরা করে দিল।

রায়াদী দাঁড়িয়ে দেখছিল এ দৃশ্য। রক্ষীরা লুটিয়ে পড়লে সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আক্রমণকারীরা এবার তার দিকে মশাল তুলে ধরলো।

তার দেহ ভরা ছিল রূপের চমক। তার সাথে এসে মিশলো ভীতা বনহরিণীর ভয়ার্ত চাহনি। মশালের উজ্জ্বল আলোয় সে রূপের দিকে তাকিয়ে আগন্তুকদের মনে হলো তারা কোন রহস্যময় পরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এমন রূপ দুনিয়ার কোন মানুষের হতে পারে না।

কালো পাগড়ীওয়ালার ইঙ্গিতে তাদের সামনে হাজির করা হলো কয়েকটি ঘোড়া। পাগড়ীওয়ালা রায়াদীকে বললো, 'ঘোড়ায় চড়ে বসো।'

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করলো রায়াদী। এবার পাগড়ীওয়ালা এবং অন্যান্যরাও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো। পাগড়ীওয়ালা রায়াদীকে বললো, 'আমার পাশে পাশে চলো।'

তাদের ঘোড়া দু'টি পাশাপাশি চলতে লাগলো। বাকীরা পিছু নিল তাদের। লোকটি রায়াদীকে বললো, 'তোমার সম্পর্কে কিছু কি বলবে আমাদের? তোমার পরিচয়, ঠিকানা?'

রায়াদী নিজের সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা ওদের খুলে বললো। এখন আর ওর মনে কোন ভয়ভীতি নেই। তার মনে হলো, এরা শত্রু নয়, বন্ধু। আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাকে মুক্ত করার জন্যই এদের পাঠিয়েছেন। তাই কোন রকম রাখঢাক না করে সব কথাই সে ওদের বলে দিল।

রায়াদীকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো, সেটা কোন মহল বা বাড়ী নয় বরং একটি চারকোণা তাবু। তার অর্ধেকটা মাটির উপর ও বাকিটা গর্তের মধ্যে। ত্রিপলের তাবুর নিচে ফুলদার মোটা রেশমী কাপড়ের সামিয়ানা। ভেতরে কার্পেট বিছানো। তাবুর ভেতর একটি প্রশস্ত পালংক পাতা। মশালের আলোয় এটাকে ঠিক তাবু মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল প্রমোদ মঞ্চ। পালংকের পাশে মদের সুরাহী রাখা। সেখানে তিন জন লোক বসে আছে।

রায়াদী শিঘ্রই জানতে পারলো, এরা খৃষ্টান। হঠাৎ যে আশা তার মনে জেগেছিল হঠাৎ করেই আবার তা নিভে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগলো, 'না, আমার মুক্তির জন্য এদেরকে আল্লাহ পাঠাননি। এরাও ডাকাত। লোকের হাত বদল হলেও ভাগ্য তার ঠেকে আছে একই জায়গায়।'

তাবুর বাসিন্দারা যখন রায়াদীকে দেখলো তখন তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। তারা অপলক চোখে তাকে দেখতে লাগলো।

কালো মুখোশধারী তার পাগড়ী খুলে ফেললো। সঙ্গীদের দিকে গর্বের দৃষ্টি হেনে বললো, 'এমন উপহার কি কোনদিন

দেখেছো? এমন অপ্সরা সুন্দরী? জানো, এ মেয়ে নর্তকী।'

রায়াদী নিরবে দাঁড়িয়েছিল। তাবুর ভেতর মশালের উজ্জ্বল আলো। রেশমী কাপড়ের সামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল রায়াদী। পায়ের নিচে মনোরম কার্পেট। আলোকিত তাবুর ভেতর দাঁড়ানো যুবতী রায়াদীকে সত্যি অপূর্ব সুন্দর ও যাদুময় দেখাচ্ছিল। তার চেহারায় কোন ভীতি বা শংকা ছিল না। বরং রাজহংসীর মতই দৃপ্ত পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

তাকে বলা হলো, 'বসো।'

সে পালংকের ওপর বসলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তুমি কোত্থেকে আসছো?'

রায়াদী তার জীবন কাহিনী আরো একবার শোনালো।

তার জীবনের করুণ কাহিনী শুনে কেউ আকৃষ্ট হলো বলে মনে হলো না। কারণ সেখানে সহানুভূতি প্রকাশের মত কোন লোক ছিল না। তারা প্রশ্ন করলো, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, 'আমাকে কোন এক খৃস্টান সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'কারা নিয়ে যাচ্ছিল? যারা তোমার সাথে ছিল তারা কি সৈনিক ছিল?'

'হ্যাঁ, আমাদের মুসলিম কাফেলা লুট হওয়ার পর আমি জানতে পারি, তারা কোন সাধারণ ডাকাত ছিল না। তারা ছিল খৃস্টান সেনাবাহিনীর নিয়মিত ফৌজ।'

এবার তাবুর ভেতরের তিনজনই তাকালো তাকে ধরে আনা লোকটির দিকে। তারা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত

কণ্ঠে বললো, 'তুমি কি তবে কোন খৃষ্টান সৈন্যকে হত্যা করেছো?'

ওই তিন জনেরই একজন ছিল ওদের কমান্ডার। সে লোকটির রাগ যেন তখন সপ্তমে। সে কঠিন চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'এই মেয়েটিকে হস্তগত করার জন্য তোমরা কয়জনকে খুন করেছো?'

কালো মুখোশপরা যে লোক রায়াদীকে ধরে এনেছিল সে জবাব দিল, 'ওদের দেখে খৃস্টান বলে মনে হচ্ছিল না, সৈন্য তো নয়ই।'

'কিন্তু এ মেয়ে কি মিথ্যে বলছে? মিথ্যে বলে তার লাভ?'

যুবক আমতা আমতা করে বললো, 'তোমরাই তো আমাকে বলেছিলে দু'তিনটা মেয়ে জোগাড় করতে, যাতে এই বিরান পাহাড়ী এলাকায় নিরানন্দ সময়টা একটু আনন্দময় করা যায়। হঠাৎ এই মেয়েটি আমার চোখে পড়ে গেল। আমি তো ওদের চারজনকেই মুসলমান বলে সন্দেহ করেছিলাম। তাদের হত্যা না করে মেয়েটিকে হস্তগত করা সম্ভব ছিল না।'

'তোমার সাথে আর কে ছিল?'

'আমার দুই সঙ্গী আর মুশেলের পাঁচজন মুসলমান ছিল যাদেরকে এখানে পাহারার কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।'

'যদি একথা প্রকাশ হয়ে যায় যে, তুমি সম্রাটের উপহার তার রক্ষীদের হত্যা করে ছিনিয়ে এনেছো, তার পরিণাম কি হবে জানো?'

লোকটি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলো। সহসা এক

ব্যক্তি তাবুর মধ্যে প্রবেশ করে বললো, 'এ গোপন কথা কোন দিন প্রকাশ হবে না। আপনারা ভয় পাচ্ছেন আমরা মুসলমানরা এ কথা প্রকাশ করে দেবো, কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এমনটি কখনও হবে না।'

'এ লোক কে?'

'ও আমার খুবই বিশ্বস্ত এক সঙ্গী।' কালো পাগড়ীওয়ালা উত্তর দিল, 'ও মুশেলের এক মশহুর আলেম এবং খুবই বিশ্বাসযোগ্য ও জ্ঞানী লোক।'

'আমি আপনাদেরই লোক।' লোকটি বললো, 'মুশেল ও আশপাশের এলাকার যে সব গোপন তথ্য আপনাদের কাছে যায় সেগুলো আমার এবং আমার সঙ্গীদের সংগৃহীত।'

তাকে আরও কিছু কথা জিজ্ঞেস করা হলো। সে এমন ভঙ্গিতে সে সব কথার উত্তর দিল যে, সবাই তাকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবতে বাধ্য হলো। কেউ সামান্যতম সন্দেহও করলো না যে, এ লোক সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক সাংঘাতিক ও দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা হতে পারে, যার আসল নাম হাসান ইদরিস।

আল্লাহ তার চেহারায় ও শারিরীক গঠনে এক অদ্ভুত সরলতা দান করেছিলেন। তার মধ্যে এমন সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল যে, কেউ দেখলে মোটেই তাকে উপেক্ষা করতে পারতো না। তার ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গিতে ছিল যাদুকরী শক্তি। লোকজন মোহগ্রস্তের মত তার কথা শুনতো। সে ভাল অভিনয় করতে পারতো এবং নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে কথা বলায় পারদর্শী ছিল।

সে বুঝতে পেরেছিল, কথিত দরবেশের সাথে মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের গভীর সম্পর্ক আছে। সে নিজেকে দরবেশের একজন ভক্ত হিসাবে জাহির করলো। মুশেলবাসীর মত সেও মেনে নিল, দরবেশের কাছে আসমান থেকে ইশারা আসে। তিনি আসমানী ইশারা পেয়ে যেদিন ইয়াজউদ্দিন ও তাঁর সৈন্য বাহিনীকে অভিযানের হুকুম দেবেন সেদিন মুশেলবাসীর ভাগ্য খুলে যাবে। তারা যেদিকেই পা বাড়াবে সেদিক থেকেই বিজয় এসে তাদের পদচুম্বন করবে। আর এ সৈন্য বাহিনী একের পর এক বিজয় লাভ করে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

•

ইয়াজউদ্দিনের বিশ্বাস ও তৎপরতা সম্পর্কে তার স্ত্রী বেগম রাজিয়া খাতুন আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন। এই মহিয়ষী মহিলা এক সময় সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর বেগম ছিলেন এবং এখনো সুলতান আইয়ুবীর মতাদর্শে বিশ্বাসী। মহলের সংবাদ তিনিই আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের জানাতেন। তিনি তার বিশ্বস্ত খাদেমা মারফত আগেই জানিয়েছিলেন, ইয়াজউদ্দিন খৃষ্টানদের জালে আটকা পড়ে গেছে। সে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তিও এখন তার আর নেই।
দরবেশ ইয়াজউদ্দিনের মহল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি খবর পাঠালেন, 'এ লোক কোন দরবেশ নয়, খৃস্টানদের এক চর মাত্র। লোকটা মনে হয় পাগল, কারণ সে এমন সব কথা বলছে যা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী। সে বলছে, সে আকাশ

থেকে ইশারা পায়। এটা চরম ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।'

রাজিয়া খাতুন গোয়েন্দাদের বললেন, 'এ দরবেশের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। দরকার হলে তাকে হত্যা করতে হবে।' রাজিয়া খাতুন সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'খৃষ্টানরা পাহাড়ের মধ্যে কিছু একটা করছে। তোমরা খোঁজ নাও তারা সেখানে কি করছে? তারপর সে খবর দ্রুত সুলতান আইয়ুবীকে পৌঁছে দাও।'

হাসান ইদরিস কৌশলে দরবেশের রহস্যময় জগতে প্রবেশের সুযোগ করে নিল। কয়েকটি ঘটনায় সে যে খৃস্টানদের আস্থাভাজন তার প্রমাণ পেশ করায় সবার মধ্যেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, এ লোকের ওপর নিশ্চিন্তে আস্থা স্থাপন করা যায়। কিন্তু তারপরও তাকে পাহাড়ের মধ্যেই থাকতে হতো। পাহাড়ের বাইরে অন্য কোথাও যাওয়ার অনুমতি ছিল না তার। কারণ সেখানে এমন কিছু গোপন ব্যাপার স্যাপার ছিল যা নিজেদের মধ্যেও জানাজানি হোক তা চাইতো না দরবেশ।

মূল রহস্য লুকিয়েছিল দরবেশের তাবু থেকে দূরে পাহাড়ের আরো ভেতরে। সেখানে পাহাড়ের অনেকগুলো উঁচু উঁচু টিলা ছিল। সেই সব টিলার আড়ালে ছিল পাহাড় ঘেরা প্রান্তর।

হাসান ইদরিস দরবেশের সাথে দেখা করার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু তেমন কোন সুযোগ সে পাচ্ছিল না। কারো কাছে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবে তেমন অবস্থাও নেই। কাউকে এ কথা বললেই তাকে সন্দেহ করে বসবে। তাই সে চুপে চুপে

সুযোগের অন্বেষায় ছিল। সে জানতো, সুযোগ এক সময় না এক সময় আসবেই। সে সুযোগ এনে দিল রায়াদী।

রায়াদীকে অপহরণ করার জন্য কালো মুখোশধারী যাদের বাছাই করেছিল হাসান ইদরিস ছিল তাদেরই একজন।

রায়াদী সেই নিম্নভূমির সামিয়ানার নিচে আরামপ্রিয় তিন খৃস্টানের বিলাসিতার সামগ্রীতে পরিণত হলো। এই তিন জনের যে সরদার সে রায়াদীকে বিনোদনের সামগ্রী ছাড়াও বেশ গুরুত্ব দিতে লাগলো তার আভিজাত্যপূর্ণ আচরণের জন্য। তাই সে চাইতো না এ মেয়ে অন্যের খেলার বস্তুতে পরিণত হোক।

রায়াদীর সৌন্দর্যের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব তাকে মোহিত করলো। তার মনে হলো, এ মেয়ে কেবল রাজ নর্তকীই নয়, সম্রাট বা অভিজাত শ্রেণীর কারো অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে জীবন কাটিয়েছে, যে কারণে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই ধরনের ব্যক্তিত্ব।

তার সৌন্দর্যে চাপল্য নেই, আছে পবিত্রতা ও নির্মলতার দুর্লভ অস্তিত্ব। সে যে কেবল নর্তকী নয় এটা তার কথাতেও ফুটে উঠতো।

এক রাতে সরদার তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি শুধু আমাকে খুশী করার জনই নাচো? আমার সাথে রাত কাটাতে কি তুমি আনন্দ পাও?'

'আমার জওয়াব শুনে আপনি হয়তো খুব খুশী হতে পারবেন না।' রায়াদী বললো, 'সত্যি কথা বললে আপনি ক্ষেপে যান কিনা সেই ভয় পাচ্ছি।'

'না, না! ভয়ের কিছু নেই। তুমি তোমার মনের কথা খুলে

বলতে পারো, আমি কিছুই মনে করবো না।'

রায়াদী তখন বললো, 'অসহায়ত্বই আমাকে এক মনলোভা খেলনা বানিয়ে দিয়েছে। আপনি যখন আশ্বাস দিয়েছেন তখন আমি আমার মনের কথা আপনাকে খোলামেলাই বলতে চাই। সত্যি কথা হলো, আপনাদের প্রতি আমার মনে আছে চরম ঘৃণা। তবু আমি আপনার সব আদেশ এ জন্যই মেনে নেই যে, এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। বলতে পারেন, আমি আমার অন্তরে আপনাদের ব্যাপারে চরম ঘৃণা লালন করি।'

'তুমি তো জানো, তোমার এমন তিক্ত কথার জন্য তোমার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি?' সরদার বললো, 'আমি তোমার এমন কমনীয় দেহ আর সুন্দর মুখ শকুনের খোরাক বানাতে পারি?'

'জানি, এবং সেটাই হবে আমার জন্য বড় পুরস্কার।' রায়াদী বললো, 'আমার জন্য কঠিন শাস্তি হলো এখনো আমার মাথা আমার দেহের সাথে আছে আর আপনার মত শকুন আমার দেহ ও আত্মা কুরে কুরে খাচ্ছে। আপনি নিজেকে যোদ্ধা ও বীর বলে মনে করেন। আপনার সেই বীরত্ব তো আমি দেখছি। এক অসহায় বালিকাকে বন্দী করে আপনি খুব গর্ববোধ করছেন। আপনার তলোয়ার ও পৌরুষ এক অসহায় নারীকে ক্রীতদাসী বানাতে চাচ্ছে।

আমার মনের বিরুদ্ধে আপনি আমার উপর কর্তৃত্ব চালাতে পারেন, কিন্তু আমি আপনার ওপর খুশী কিনা এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন না। বরং আমি এই দাবী করতে পারি, আমার

সঙ্গ ও আমার নাচ আপনার মনে আনন্দ জাগায়। আপনি নন বরং আমিই আপনার ওপর অনুগ্রহ করছি।'

এত কঠিন কথার পরও সরদার না রেগে বললো, 'আমি শক্তি দিয়ে তোমাকে বশীভূত করতে চাই না, চাই ভালবাসা দিয়ে তোমার মনে একটু জায়গা করে নিতে। আমি যদি তোমার সামনে সোনা ভর্তি ডালা এনে রেখে দিয়ে তোমার অনুগ্রহ চাই তবে কি তুমি আমাকে স্বামী বলে মেনে নেবে?'

'না!' রায়াদী উত্তর দিল, 'আমি যে পুরস্কার চাই সে পুরস্কার তোমার কাছে নেই। সে পুরস্কার আমাকে জীবনে একজনই দিয়েছিল, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই। তোমরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছো। আমার শরীরের উপর তার কোন লোভ লালসা ছিল না। সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাকে ভালবাসা দিতে পেরেছিল এবং আমার ভালবাসা নিতে পেরেছিল। ভালবাসার কথা তোমাদের মুখে মানায় না। লালসা আর ভালবাসা এক জিনিস নয়। তোমরা তো সব শকুন, শিয়াল আর নেকড়ে!'

'সে তোমাকে যে ভালবাসা দিয়েছিল যদি আমি তোমাকে সেই ভালবাসা দেই, তবে?'

'আমি না আমার আত্মা ভালবাসার পিপাসু।' সে বললো, 'সেই পবিত্র ভালবাসা তুমি কোথায় পাবে? প্রকৃত ভালবাসা দিতে বা পেতে হলে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সেই ত্যাগ তুমি স্বীকার করতে পারবে না। তুমি আমার ভালবাসা নয় শরীরের কাঙাল, মিছেমিছি কেন এক নারীকে ভালবাসার প্রলোভন

দেখাচ্ছো?'

'সত্যি বলছি, তোমাকে আমি প্রলোভন দেখাচ্ছি না। তোমার জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। বলো, তুমি আমার কি পরীক্ষা নিতে চাও?'

সরদার দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বলে মদের পিয়ালা হাতে তুলে নিল। পিয়ালা মুখে লাগাবে এমন সময় রায়াদী দ্রুত তার কাছ থেকে পিয়ালাটি কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বললো, 'তুমি অনেক কথা বলেছো, এখন আমার কথা শুনে নাও। মদ তোমার জ্ঞান বুদ্ধি গুলিয়ে দেবে। তোমার মনের আবেগ, ভালবাসার আলো সব অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দেবে।

তুমি জানতে চেয়েছো, তুমি প্রকৃত ভালবাসা দিলে আমি তা গ্রহণ করবো কিনা? এবার আমার মতামত শুনে নাও। সত্যিকার ভালবাসা যদি তুমি দিতে পারো তবে অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করবো। কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসো তা প্রমাণ করতে হবে। তুমি তোমার প্রকৃত ভালবাসা দেখাও।

যদি আমার আত্মা তোমার ভালবাসার সুবাস পায় তবে সে ঠিকই তাতে সাড়া দেবে। তখন আমি তোমার সাথে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হাসি মুখে ছুটে যাবো। যে কোন বিপদ মাথা পেতে নেবো, তোমার সাথে মরুভূমিতে ছুটে বেড়াবো নিশ্চিন্ত মনে। ভালবাসা পেলে তোমার সঙ্গী হয়ে মরতেও আপত্তি নেই আমার।'

সরদার পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তার এলোমেলো চুল বাতাসে দোল খাচ্ছে। চোখে মায়াময়

সম্মোহনী। সেখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের সুস্পষ্ট দোলাচল। একটু আগেও সেখানে ছিল সীমাহীন অবজ্ঞা ও ঘৃণা। আর সেই ঘৃণা কত নির্ভয়ে প্রকাশ করলো মেয়েটি। এমন সরলতা কেবল তার পক্ষেই প্রকাশ করা সম্ভব যার মধ্যে এখনো মানবিক প্রেমপ্রীতি ও মায়ার আবেশ রয়েছে।

তার হাত থেকে মেয়েটি যখন মদের পিয়ালা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল তখনই তার ভেতরটা কেমন যেন নড়ে উঠলো। তার পৌরুষ ও চেতনা শিথিল হয়ে এলো। সে এমন অসহায় বোধ করলো যেন তার নিজের ওপর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই মেয়ে যেন তাকে যাদু করেছে। এখন তার কথায় উঠবস করা ছাড়া সে আর কিছুই কল্পনা করতে পারছিল না।

এটা পুরুষের স্বভাব যে, সে দশ জন লোকের সাথে লড়াই করতে পারে, বাঘের সাথে যুদ্ধ করতে পারে কিন্তু যে নারীকে সে পছন্দ করে সে যদি একবার বলে, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি' তখন সে পুরুষ বালির স্তুপের মত ধ্বসে যায়। সরদারের মনের অবস্থাও এখন অনেকটা সে রকম। যে লোক যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর সাথে লড়েছে সে এখন এক নারীর কাছে আত্মসমর্পন করে বসে আছে।

'আমি তোমাকে আমার কোন সাথীর খেলনা হতে দেবো না।'

'আমি এটাকে সাদরে গ্রহণ করি।' রায়াদী বললো, 'আমি আত্মহত্যা করবো না, কারণ এটা ভীরুতা। আমি পালাবার চেষ্টাও করবো না, কারণ পালিয়ে যাওয়ার মত কোন জায়গা নেই আমার। আমি তোমাকে ছলনাও করবো না, কারণ ছলনা

কর‌্যার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে। আমার আত্মা মরে গিয়েছিল, যদি তাকে তুমি বাঁচিয়ে তুলতে পারো তবে তা তোমারই থাকবে।'

সে রায়াদীর একটি হাত চেপে ধরে বললো, 'আজ আমি প্রথম অনুভব করলাম, তোমার মনে কত ব্যথা ও জ্বালা। আমি তোমার ব্যথার সাথী হতে চাই।'

রায়াদী যেন নতুন করে জীবন পেলো। সে তার প্রিয় ব্যথাতুর একটি গানে গুনগুনিয়ে সুর তুললো।

'তুমি তো নর্তকী জানতাম, গানও গাইতে পারো?'

'হ্যাঁ, আমি গানও করি।' রায়াদী বললো, 'কিন্তু সেই গান গাই, যাতে বেদনা আছে, কষ্টের কান্না আছে।' সে গুন গুন করে গাইতে লাগলো, 'কাফেলা চলেছে হেজাযের পথে---'

গান তো নয়, রায়াদীর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছিল অন্তর নিঙড়ানো কান্নার ব্যাকুল ধ্বনি। গানের ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠছিল তার ভালবাসা, তার অন্তরের বেদনা ও কষ্ট। তার স্বপ্নের সেই রাজকুমার যেন তাকে আবার আশা ও আলোর পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হেজাযের পথে শহীদ হওয়া রাজকুমারের হাত ধরে সে হেঁটে যাচ্ছিল চন্দ্রালোকিত মরুভূমি মাড়িয়ে। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

সামিয়ানার ভেতরের পরিবেশ পাল্টে গেল। সেখানে এখন করুণ সুরের অবিচ্ছিন্ন ধারা বয়ে যাচ্ছে। রায়াদী আপন মনে গান গেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে তার গানের তাল আরও বেদনাময় হয়ে উঠলো।

তার আবেগে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে জন্য সরদার পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল বসে ছিল। এক সময় রায়াদী বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, খৃস্টান সরদারের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। সরদার অনুভব করলো, এমন ঘুমের ভাব তার আগে কখনও আসেনি। প্রতি রাতে সে মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে যেতো এবং সেই মাতাল অবস্থাতেই সে ঘুমিয়ে যেতো। আজ সে মদ পান করেনি, কিন্তু ঘুম তাকে ঠিকই চেতনার রাজ্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

যখন সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল তখন রায়াদী গান থামিয়ে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। লোকটি পালংকের উপর শুয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে রায়াদীর মনে একই সাথে জমা হচ্ছিল ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রেম ও সহানুভূতির বিচিত্র ভাব। বার বার তার চেহারা পাল্টে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ নিরবে সে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এক সময় কোমর থেকে খঞ্জর বের করে শক্ত মুঠোতে ধারণ করলো। তারপর খঞ্জর বাগিয়ে সে এগিয়ে গেল ঘুমন্ত খৃষ্টানের দিকে।

সে খঞ্জরের মাথা খৃস্টানের গর্দানের শাহ রগের কাছে নিল। কি মনে করে সেই খঞ্জর ঘুরিয়ে নিজের বুকের ওপর ধরলো। আবার সেখান থেকে খঞ্জর সরিয়ে খৃস্টানের গর্দান বরাবর হাত উঠালো। এ সময় তাবুর দরজার কাছে কেউ চুপ থাকার সংকেত সূচক 'ইশ্‌শ্' শব্দ করলো।

রায়াদী দ্রুত খঞ্জর সরিয়ে তাকালো দরজার দিকে। দেখলো,

সামিয়ানার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই সুন্দর যুবক, যাকে সে খৃষ্টানদের বন্ধু ভাবলেও সে ছিল আইয়ুবীর গোয়েন্দা, হাসান ইদরিস।

হাসান ইদরিস ইশারায় রায়াদীকে নিজের কাছে ডাকলো। রায়াদী খঞ্জরটি খাপে পুরে কোমরে গুঁজে নিয়ে এগুলো তার দিকে।

হাসান ইদরিস অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'বাইরে এসো, গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

রায়াদী প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তার দিকে। যাবে কি যাবে না যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। হাসান ইদরিস আবারও তাকে ইশারা করলো। রায়াদী সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে তাবুর বাইরে পা রাখলো।

হাসান ইদরিস তাকে বললো, 'আজ রাতে এ লোক একা এ তাবুতে রয়েছে। অন্যরা অনেক দিনের জন্য দূরে চলে গেছে। এ ব্যক্তি আমার হেফাজতে আছে। ঘুমন্ত লোককে আমরা হত্যা করি না। একে যে হত্যা করবে সে আমার হাতে মারা যাবে। তুমিই তো তাকে বলেছো, 'আমি আত্মহত্যা করবো না, কারণ এটা ভীরুতা, আমি পালাবোও না, কারণ পালাবার মত কোন জায়গা আমার নেই। আর আমি ছলনাও করবো না।' কিন্তু তুমি ঘুমন্ত লোককে হত্যা করতে চাচ্ছো, এটা কি প্রতারণা ও ছলনা নয়?'

'তুমি কি তাকে কি বলে দেবে যে, আমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করতে চেয়েছিলাম? তার গর্দানে খঞ্জর ধরেছিলাম?'

রায়াদী প্রশ্ন করলো এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'বলে দিও। তখন সে আমাকে হত্যা করবে আর তাতেই আমার মঙ্গল হবে। সে তোমাকেও পুরস্কার দেবে আর তাতে তোমারও লাভ হবে।'

'এ লোককে আমিও দারুণ ঘৃণা করি। তুমি যেমন ঘৃণা করো তারচে বেশী।' হাসান ইদরিস বললো, 'তবু আমি তাকে হত্যা করিনি এবং কিছুই বলবো না। এমনকি তুমি যে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে তাও তাকে বলবো না।'

'এর বিনিময়ে তুমি আমার কাছে কি পুরস্কার চাইবে?' রায়াদী প্রশ্ন করলো, 'আমার কাছে তো দেয়ার মত কিছু নেই। তুমি কি আমাকেই পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করতে চাও?'

'না, না।' হাসান ইদরিস বললো, 'আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। আমি কেন ঘৃণা করার পরও তাকে হত্যা করছি না, জানতে চাও?'

রায়াদী বললো, 'বলো।'

সে রায়াদীকে একটু দূরে নিয়ে গেল এবং স্বর পাল্টে তাকে বললো, 'আমিও তোমার মত হেজাযের এক মুসাফির। আমি যে রাতে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছিলাম সে রাতেই তুমি আমাদেরকে তোমার জীবন কাহিনী শুনিয়েছিলে। তুমি তোমার মনের আবেগ গোপন না করে আমাদের সামনে সবটাই প্রকাশ করেছিলে। আমি তখন থেকেই চিন্তা করছিলাম তোমাকে পূণ্য লাভের এমন পথ বাতলে দেবো যাতে আল্লাহ খুশী হন।'

'কেন তুমি এমন চিন্তা করতে গেলে?' চিন্তান্বিত রায়াদীর প্রশ্ন।

হাসান ইদরিস বললো, 'কারণ আমিও তোমার মত হেজাযের মুসাফির। বিশেষ প্রয়োজনে আমি এই খৃস্টানদের সাথে আছি। কাজ শেষ হলেই আমি আমার পথে পা বাড়াবো।'

'কাজটা কি?'

'সে কথাই তোমাকে বলতে চাই।' হাসান ইদরিস বলে যেতে লাগলো। গভীর মনযোগের সাথে তার কথা শুনতে লাগলো রায়াদী।

হাসান ইদরিসের কথা রায়াদী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে গেল। সুলতান আইয়ুবীর এই গোয়েন্দা জানতো তাকে কি কথা বলতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এই সুন্দরী নারীর হৃদয় জয় করে নিল। হাসান ইদরিস তাকে বললো, 'এবার তুমি চলে যাও। এই খৃস্টানের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করো। তাকে হত্যা করে নয়, বাঁচিয়ে রেখেই আমাদের কাজ হাসিল করতে হবে।'

রায়াদী তার কাছ থেকে যেতে চাচ্ছিল না। হাসান ইদরিস তাকে জোর করে যেতে বাধ্য করলো। রায়াদী নতুন এক স্বপ্ন নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

তারা তিন চার দিন এভাবেই রাতে গোপনে দেখা করলো। হাসান ইদরিস রায়াদীকে নতুন প্রেরণা ও স্বপ্ন-কল্পনার যাদুতে আচ্ছন্ন করে নিল।

রায়াদী তাকে হেজাযের কথা জিজ্ঞেস করতো। হাসান ইদরিস আবেগময় ভঙ্গিতে তাকে শোনাতো হেজাযের আকর্ষণীয় বর্ণনা।

দিনের বেলায় হাসান ইদরিস চেষ্টা করতো, যেখানে তাকে

যেতে দেয়া হয় না সেখানে আসলে কি আছে জানতে। কিন্তু এ পর্যন্ত সে কিছুই জানতে পারেনি।

এক রাতে সে রায়াদীকে বললো, 'এই লোকেরা পাহাড়ের মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখেছে। তারা এখানে কি লুকিয়ে রেখেছে সে কথা জানতেই আমি এখানে এসেছি।'

রায়াদী বিস্মিত হয়ে বললো, 'কেন, এখানো জানতে পারোনি এখানে কি আছে? আমি তো সে খবর এরই মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছি। এখানে আছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম! সরদার আমাকে বলেছে, এখানে আগ্নেয়াস্ত্র ও আগুন জ্বালানোর জন্য পেট্রোল জাতীয় তেলের বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। এত বেশী তেল এখানে জমা করা হয়েছে যে, আশেপাশের মুসলমানদের সমস্ত শহর আগুন দিয়ে পুড়িয়েও তা শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে এখন আমি সরদারের ক্রীতদাসী ও আশ্রিতা। কিন্তু সেও আমার এমন বাধ্য যে, সে আমার হুকুমের তাবেদার হয়ে গেছে।'

'তুমি কি এতে খুশী যে, তোমার মনীব তোমার চাকরের মত বাধ্য?'

'না!' রায়াদী উদাস ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'আমার আত্মা কখনও এতে খুশী হতে পারে না। আমাকে যারা হেজাযের পথ থেকে ধরে এনেছিল তারা বলেছিল, খোদা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তুমি এমন নেকীর কাজ করো যাতে খোদা তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

আমি তো সেই নেকী লাভের জন্যই হেজাযের পথে রওনা হয়েছিলাম। যে আমাকে হেজায নিয়ে যাচ্ছিল সে বলেছিল,

আমরা হজ্জ করে পাক পবিত্র হয়ে যাবো। আর সেখানে বিয়ে করে পবিত্র জীবন যাপন করবো। কিন্তু আমি তো এখন আরো পাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। হয়তো এ জন্য আল্লাহ আমাকে আরো শাস্তি দিয়ে যাবেন।'

'না, এখন তুমি যে কাজ করছো তাতে আল্লাহ খুশী হবেন। জমজমের পানি নয়, তোমাকে পবিত্র করবে আগুন।' হাসান ইদরিস হেসে বললো, 'তুমি হেজায যেতে পারোনি তাতে দুঃখ করো না। তুমি হেজাযের অনুসারীদের সাহায্য করো, আল্লাহ তোমার প্রতি খুশী হবেন। তাতেই তোমার আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, তুমিও মুক্তি পাবে।'

'কে সেই হেজাযের অনুসারী?' রায়াদী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে আমি সাহায্য করবো? কিভাবে করবো? আর তুমি কোন আগুনের কথা বলছো, যে আগুন আমাকে পবিত্র করতে পারে?'

'হেজাযের অনুসারী সুলতান আইয়ুবী।' হাসান ইদরিস বললো, 'আর আগুন হচ্ছে যুদ্ধের দাবানল। এই পাহাড়ের মধ্যে যুদ্ধের যে সরঞ্জাম জমা করা হয়েছে তুমি আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও, এতেই তুমি প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান পাবে। তোমার অতীতের সব গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন।'

রায়াদী জানতে চাইলো সুলতান আইয়ুবী সম্পর্কে। হাসান ইদরিস তাকে শোনালো সুলতান আইয়ুবীর সংকল্পের কথা। সে তাকে খৃষ্টানদের পরিকল্পনার কথাও জানালো। মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য আইয়ুবীর জানবাজ বাহিনী কি

করতে চাচ্ছে খুলে বললো তাকে। এতে খৃষ্টানদের প্রতি রায়াদীর ঘৃণা ও ক্ষোভ আরো বাড়লো। হাসান ইদরিসের কথা শুনে সে বুঝতে পারলো, হক ও বাতিলের লড়াইটা আসলে কি এবং এ সংঘর্ষে হকের পথে থাকাটা কত জরুরী।

পরের দিন হাসান ইদরিস দেখলো, রায়াদী ঘোড়ার পিঠে চড়ে খৃষ্টান সরদারের সাথে কোথাও যাচ্ছে। ওরা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে হাসান ইদরিসদের যাওয়া নিষেধ। হাসান বুঝলো, রায়াদী কাজে নেমে পড়েছে।

রাতে রায়াদী সরদারকে ঘুম পাড়িয়ে তাবুর বাইরে এলো। সে জানে সরদারের এ ঘুম সহজে ভাঙবে না। কারণ হাসান ইদরিস তাকে একটা ছোট পাউডারের কৌটা দিয়েছিল। বলেছিল, 'এখান থেকে কিছু পাউডার মদের সাথে মিশিয়ে সরদারকে পান করাবে। ভয় নেই, এতে সরদার মরবে না। তবে আরামের ঘুম হবে।' সেই পাউডার সে আজ মদের সাথে মিশিয়ে খাইয়েছে সরদারকে।

তাবু থেকে বেরিয়ে রায়াদী সেখানে গিয়ে পৌছলো যেখানে হাসান ইদরিস তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রায়াদী বললো, 'সেখানে বিরাট আকারের পর্বত গহবর। খৃষ্টানরা খোদাই করে তাকে আরো প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে নিয়েছে। লম্বা ও চওড়ায় এত বড় গহবর যে, মুখ থেকে তার সবটা দেখা যায় না।'

'তুমি কি গহবরের ভেতরে ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, সেখানে আমি হাজার হাজার পেট্রোলের মটকা ও হাড়ি

দেখেছি। সেই সাথে আছে তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার, খাদ্য সামগ্রী, তাবু, কাপড় এবং অপরিমেয় জিনিষপত্র।'

'তিনি তোমাকে সেখানে নিলেন?'

'কেন নেবেন না? আমি কি তার শত্রু? আমি তো তার রাণী। আমি সরদারের কাছে শিশুর মত বায়না ধরলাম। বললাম, 'যে পাহাড়ের পাশে তোমরা অস্ত্রভান্ডার গড়ে তুলেছো আমি সেখানে যাবো। আমি দেখতে চাই আমার হবু স্বামী আমাকে যা বলছে তা সত্যি, নাকি আমাকে পটানোর জন্য গপ্পো মারছে।'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখবে। কাল সকালেই আমি তোমাকে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাবো। কিন্তু সাবধান সেখানে যা দেখবে তা নিয়ে কারো সাথে গল্প জুড়ে দিও না।

আমি বললাম, 'তুমি আমাকে এত বোকা ভাবো কেন? ওগুলো যে গোপন জিনিস তা কি আমি জানি না।'

তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে সত্যি সত্যি তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন।'

'ওখানে সেই অস্ত্রভান্ডারের নিরাপত্তার জন্য তারা কি ব্যবস্থা নিয়েছে?' জানতে চাইলো হাসান ইদরিস।

'গহ্বরের সামনে দু'জন প্রহরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।' রায়াদী বললো, 'তবে গহ্বরের মুখ খোলা। আর গহ্বর থেকে দেড়-দুইশ গজ দূরে প্রহরীদের থাকার জন্য একটা ক্যাম্প আছে। ডিউটি শেষ হলে পাহারাদাররা ওখানেই বিশ্রাম নেয়। ক্যাম্পের সামান্য দূরে দেখলাম একটা তাবু। তাবুর বাইরে

এক বুড়ো লোক বসে বসে ঝিমুচ্ছে।
সরদার তাকে পা দিয়ে গুতো দিয়ে সচেতন করে বললো, 'কি খবর দরবেশ সাহেব! কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? সময় মত খাওয়া দাওয়া পাচ্ছো তো?'
বৃদ্ধ দুর্বল স্বরে বললো, 'জনাব, আমাকে কবে মুক্তি দেবেন? আমাকে এখন যেতে দিন।'
সরদার অবজ্ঞার স্বরে বললো, 'আর কটা দিন অপেক্ষা করো। এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন? ধৈর্য ধরো, অনেক পুরস্কার পাবে।'
এটা সম্ভবত সেই দরবেশ, যার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে।'
'হ্যাঁ।' হাসান ইদরিস বললো, 'এটা খৃস্টানদের সেই প্রতারণা; যে প্রতারণা মুশেলবাসী ও মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'
রায়াদী হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার খবর তো এনে দিলাম। এবার বলো, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন?'
'হ্যাঁ রায়াদী। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, মেহেরবান। নিশ্চয়ই তিনি তোমার গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন। এসো আমরা দু'জন আমাদের সফলতা এবং আমাদের অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত পাপের জন্য তওবা করে তার কাছে ক্ষমা চাই।'
মোনাজাত শেষ হলে দু'জন যাত্রা করলো। অতি সাবধানে পা ফেলছে ওরা। রাতের আঁধার তাদেরকে সাহায্য করছে। তারা পাহাড়ের সরু গলি দিয়ে চলতে চলতে থেমে যেতো। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখে নিত ভাল করে। তারপর

আবার পথ চলতো।

দিনের বেলা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল বলে জায়গাটা কাছেই মনে হয়েছিল রায়াদীর। এখন হাঁটতে গিয়ে অনুভব করলো, দূর মোটামুটি মন্দ নয়।

এক সময় তারা পৌঁছে গেল লক্ষ্যস্থলে। হাসান দূর থেকেই দেখতে পেলো গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রহরী। তাদের পাশে মশাল জ্বলছে। মশালের লাঠি মাটিতে পোতা।

হাসান ইদরিস পা টিপে টিপে পাহারারদের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রায়াদীকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে এক পাথরের আড়ালে বসে গেল সে। তারপর প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আস্তে করে একটা কাশি দিল।

এক প্রহরী চমকে উঠে বললো, 'কে?'

হাসান এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো। প্রহরী সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে দু'পা এগিয়ে গেল। অন্ধকারের জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

প্রহরী আরো কয়েক কদম এগিয়ে পাথরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হাসান ইদরিস সন্তর্পনে উঠে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে তার গলা এমন জোরে চেপে ধরলো যে, তার আর শব্দ করার উপায় রইলো না।

হাসান এক হাতে প্রহরীর গলা পেঁচিয়ে রেখে অন্য হাতের খঞ্জর দিয়ে তার বুকে দু'তিন ঘা বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো কিন্তু তার শরীর নিথর হওয়ার আগ পর্যন্ত ওভাবেই সে প্রহরীর গলা চেপে ধরে রাখলো। যখন বুঝলো, আর কোন

দিন নড়াচড়া করতে পারবে না সে, তখন হাসান লাশটি আস্তে করে নামিয়ে রাখলো মাটিতে।

এরপর হাসান ইদরিস লাশটি টেনে পাথরের আড়ালে নিয়ে গেলো। লাশটি ওখানে নিয়ে সে নিজেও সেই পাথরের আড়ালে আবার বসে পড়লো। সেখানে বসেই সে অপেক্ষা করতে লাগলো অপর প্রহরীর জন্য।

সাথীকে ফিরতে না দেখে অপর প্রহরী তাকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু কেউ তার ডাকের উত্তর পেল না।

সেই প্রহরী ব্যাপার কি দেখার জন্য এবার নিজেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। পাথরের কাছে এসে সেও আগের প্রহরীর মত থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। কিন্তু আশেপাশে কাউকেই দেখতে পেলো না সে। খুঁজতে গিয়ে তার মনে হলো অন্ধকারে তার সামনে মাটিতে কি যেন পড়ে আছে। সে দু'পা এগিয়ে পড়ে থাকা জিনিসটার কাছে গিয়ে তার সাথীকে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো।

সে ঝুঁকে তাকে দেখতে গেল আর এই সুযোগে হাসান ইদরিস তার গলায় এমন ফাঁস লাগিয়ে দিল যে, তার আর চিৎকার করারও সুযোগ রইলো না।

হাসান দ্বিতীয় প্রহরীকে পাকড়াও করতেই রায়াদী তার লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো এবং অপেক্ষা না করে দ্রুত ছুটে গেল গুহামুখের মশালের কাছে। সে একটি মশাল মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে গেল।

হাসান ইদরিস দ্বিতীয় প্রহরীকে হত্যা করে উঠে দাঁড়ালো। তার

অন্য সঙ্গীরা তখন ক্যাম্পের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। গুহার মুখে কি ঘটেছে কিছুই তারা জানতে পারলো না।

হাসান ইদরিস আস্তে করে ডাকলো রায়াদীকে কিন্তু রায়াদীর কোন সাড়া নেই। যেখানে তাকে রেখে এসেছিল সেখানে নেই রায়াদী। হাসান এবার ছুটলো গুহার মুখের দিকে। দেখলো সেখানকার একটি মশাল উধাও। যা বুঝার বুঝে গেল হাসান। সে কালবিলম্ব না করে অপর মশালটি হাতে নিয়ে ঢুকে গেল গুহার ভেতরে।

ইতিমধ্যে গুহার মধ্যে জ্বলে উঠলো আলো। হাসান দেখলো, রায়াদী দৌড়ে বাইরে চলে আসছে। তার কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। সে ছুটছে পাগলের মত।

ঘটনা হচ্ছে, রায়াদী গুহার মধ্যে ঢুকেই দেখতে পেলো হাজার হাজার পেট্রোলের ড্রাম ও হাড়ি। এতে আগুন দিলে কি ঘটবে জানা ছিল না রায়াদীর, সে আবেগের চোটে এক হাড়ির মুখে মশাল ঠেসে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো আগুন। সে জানতো না, এই তেল দপ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আগুন রায়াদীকে ঘিরে ফেললো এবং তার পরণের কাপড়েও আগুন লেগে গেল।

হাসান ইদরিস ছুটলো রায়াদীকে বাঁচাতে। সে যখন তাকে ধরলো ততোক্ষণে তার সুন্দর দেহ খামছে ধরেছে লকলকে আগুন। তার রেশমের মত কোমল চুল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হাসান ইদরিস তার পোড়া শরীর জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। রায়াদীর কাপড়ের আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের হাত

পুড়িয়ে ফেললো। কাপড়ের আগুন নিভলেও অগ্নিদগ্ধ রায়াদী তখন জ্ঞান হারিয়েছে। পুড়ে গেছে শরীরের বিভিন্ন অংশ। চোখ ঝলসে গেছে। পুড়ে গেছে চোখের ভুরু।

হাসান অজ্ঞান রায়াদীকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল গুহার মুখের দিকে। গুহার ভেতর তখন প্রলয় চলছে। ভীষণ শব্দ করে ফাটছে তেলের ড্রাম ও হাড়ি।

এক ড্রাম থেকে আরেক ড্রামে এক হাড়ি থেকে আরেক হাড়িতে ছুটছে আগুন। মাটির মটকা ও হাড়িগুলো ভীষণ শব্দে ফাটছে আর তাতে কেঁপে উঠছে মাটি ও পাহাড়। হাজার হাজার মন পেট্রোলের মটকা ও হাড়ি যখন একই সঙ্গে ফাটতে লাগলো তখন গুহায় মাটি ও পাথর খসে খসে পড়তে লাগলো তার ওপর। খৃষ্টানদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, তাবু ও খাদ্য সামগ্রী তাতে পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল।

বোমার মত বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো মুশেল শহরও। মুশেলবাসীদের মনে সৃষ্টি হলো অজানা আতংক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল গুহার মুখ। ভাগ্যিস রায়াদীকে কাঁধে নিয়ে হাসান ইদরিস ততোক্ষণে বেরিয়ে এসেছিল গুহা থেকে। নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে যাওয়ার গোপন পথ জানা ছিল হাসানের। সে রায়াদীকে কাঁধে নিয়েই ছুটলো। ইচ্ছে, এই অভিশপ্ত পাহাড়ের ধ্বংসের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো। ফলে পেছনে কি ঘটছে না ঘটছে দেখার সুযোগ রইলো না তার। সে ছুটছে তো ছুটছেই।

শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলো না হাসান। কারণ শহরের

দরজা তখন বন্ধ। সে মুশেল শহরকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো নসিবার দিকে।

এক সময় তারা বিপদসীমা অতিক্রম করে গেলো। তখনো তার কাঁধে চেপে আছে রায়াদী। একজন সোমত্ত মেয়েকে কাঁধে নিয়ে এত দূর দৌড়ে এসে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লো হাসান ইদরিস। সে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর রায়াদীকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

রায়াদী ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছিল। হাসান মাটিতে বসে পড়ে কান পাতলো সেদিকে। রায়াদী তখন বলছে, 'আগুন! আমাকে পবিত্র করে দিয়েছে!'

আকাশে ততোক্ষণে চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় সে রায়াদীর চেহারায় দৃষ্টি ফেললো। তার মনে হলো সে হাসছে এবং স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলছে, 'হেজাযের দিকে চলেছে কাফেলা, সেখানে গিয়ে আমার বিয়ে হবে।'

'রায়াদী! রায়াদী!' হাসান ইদরিস তাকে ডাকলো।

'আল্লাহ্ আমার গোনাহ্ ক্ষমা করেছেন তো?' রায়াদী চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলো।

হাসান ইদরিস বললো, 'রায়াদী, তুমি ঠিক আছো তো? আল্লাহ্র হাজার শোকর যে তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

রায়াদী উঠে বসলো এবং তার বাহু সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'দেখো! দেখো! সে যাচ্ছে। দেখো, হেজাযের কাফেলা যাচ্ছে। আমিও যাবো তাদের সাথে।'

রায়াদী একদিকে ঢলে পড়লো। হাসান ইদরিস তার বাহু ধরে

ঝাঁকি দিয়ে ডাকলো, 'রায়াদী! রায়াদী!'
কিন্তু রায়াদীর সময় তখন ফুরিয়ে গেছে। তার নাড়ীর স্পন্দন থেমে গেল। রায়াদীর আত্মা দেহের খাঁচা ছেড়ে উড়াল দিল হেজাযের কাফেলার সাথে।
হাসান ইদরিস বালি খুঁড়ে কবর খোদাই করলো রায়াদীর জন্য। সকাল হওয়ার আগেই রায়াদীর শরীরের মাপে সে আড়াই ফুট গভীর এক গর্ত খনন করে সেই গর্তে শুইয়ে দিল রায়াদীকে এবং তাকে মাটি চাপা দিয়ে আবার পথে নামলো।

কয়েকদিন পর।
সুলতান আইয়ুবী একদিন সংবাদ পেলেন, খৃষ্টানদের সামরিক সম্ভার ও রসদপত্র সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি তখন আল খালিদের দিকে অভিযান চালাচ্ছিলেন।
আল খালিদ একটা বড় রাজ্য। এর শাসক ছিলেন শাহ আরমান।
সুলতান একদিন খবর পেলেন আল খালিদের শাসক শাহ আরমান মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনকে হারজাম নামক স্থানে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় পরস্পরকে সাহায্য করার সন্ধিচুক্তি করা। সুলতান আইয়ুবী এ সংবাদ জানতে পেরে আল খালিদে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।
তিনি যখন আল খালিদ অবরোধ করার জন্য অভিযান নিয়ে যাচ্ছেন তখনই তিনি পথিমধ্যে খবর পেলেন, খৃষ্টানদের সমুদয়

সামরিক রসদ সম্ভার ধ্বংস হয়ে গেছে।

খৃষ্টানদের জন্য এ আঘাত ছিল বড় মর্মান্তিক ও মারাত্মক। তাদের পরিকল্পনা ছিল, মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কোন পাহাড়ের গুহায় বিশাল অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলা যাতে লড়াইয়ের সময় সেখান থেকে আশাতীত সাহায্য পাওয়া যায়।

এ জন্য তারা অনেক খুঁজে এ পাহাড়ের গুহাটি আবিস্কার করে। তারপর তাদের অনুগত এক আলেমকে দরবেশ সাজিয়ে ওখানে প্রেরণ করে পরিবেশ তৈরীর জন্য। এরপর তারা গোপনে সেখানে এনে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের যাবতীয় রসদ সম্ভার জমা করতে থাকে।

তারা এই গহবরে এত অধিক সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানী ও পেট্রোলের মটকা লুকিয়ে রেখেছিল, যা দিয়ে আশপাশের সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলোর কেল্লা ও সেনানিবাস ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা সম্ভব ছিল।

ইয়াজউদ্দিন এখন সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছিল। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর দরবেশ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। কথা ছিল খৃস্টান বাহিনী এলে তিনি মুশেলের সৈন্য বাহিনীকে অভিযানের ইঙ্গিত দেবেন।

খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিল, ইয়াজউদ্দিন অভিযানে বেরোলে তাদের সহায়তা করবে খৃস্টান বাহিনী। যুদ্ধ পরিচালিত হবে ইয়াজউদ্দিনের নামে কিন্তু মূল যুদ্ধ করবে খৃস্টানরা। এদিকে ইয়াজউদ্দিন মুশেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার রাজধানী

পাহারা দেয়ার নাম করে মুশেলে থেকে যাবে খৃষ্টান বাহিনীর একটা অংশ এবং তখন থেকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে মুশেল। ইয়াজউদ্দিন একবার বেরিয়ে যাওয়ার পর আর কোন দিন যেন সে মুশেল প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করবে এই বাহিনী।

কিন্তু খৃষ্টানদের সমস্ত পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে গেল। আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা তাদের সমস্ত রসদ সামগ্রী ধ্বংস করে দিয়েছে। যেহেতু এসব যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম পাহাড়ের গভীরে বিশাল ও প্রশস্ত গহবরে সঞ্চিত ও রক্ষিত ছিল সে জন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না সে রাতে পাহাড়ে কি ঘটেছে। বিস্ফোরণের ফলে দূর দূরান্ত পর্যন্ত মাটি কেঁপে উঠেছে। বিকট আওয়াজে ভূকম্পন হয়েছে। মানুষ ভেবেছে, বড় রকমের ভূমিকম্প ঘটে গেছে পাহাড় ও সন্নিহিত এলাকায়।

এতে সবচে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খৃষ্টানরা। তারা কাউকে বলতেও পারছে না তাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। কারণ পুরো ব্যাপারটাই ছিল গোপন। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুশেলের শাসক ইয়াজউদ্দিন। তিনি জানতেন, তার সবচেয়ে বড় বন্ধু খৃষ্টানরা তাকে সহায়তা করার জন্য পাহাড়ে অস্ত্রের মজুত গড়ে তুলছে। এ অস্ত্র আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তার কাজে আসবে। কিন্তু তিনি জানতেন না, কি পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদ খৃষ্টানরা ওখানে জমা করেছে।

এই ঘটনায় ইয়াজউদ্দিনের কোমর ভেঙে গেল। খৃষ্টানদের সাথে তার যে চুক্তি হয়েছিল এ ঘটনার পরও তারা তাকে সেই

সহায়তা দেবে কিনা তা অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। ফলে জোটের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যে গোপন চুক্তি ছিল খৃস্টানদের সাথে তা যদি তারা রক্ষা না করে তবে ইয়াজউদ্দিনের পায়ের তলে আর মাটি থাকে না।

এদিকে খৃস্টানদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারাই এ কাজ করেছে। কিন্তু তারা ভেবে পেলো না, এত গোপনীয়তার পরও সুলতানের গোয়েন্দারা এই অস্ত্রভান্ডারের খবর পেলো কেমন করে আর তাতে অভিযানইবা চালালো কি করে? তারা স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তারা।

কিন্তু আল্লাহ যখন কারো সাহায্যকারী হয়ে যান তখন অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন যারা জানপ্রাণ দিয়ে তার পথে লড়াই করে।

হাসান ইদরিস যখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুশমনের আস্তানায় প্রবেশ করেছিল তখনো সে জানতো না, কিভাবে এই ঘাঁটি সে ধ্বংস করবে। কিন্তু তার চেষ্টা ও প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে নিলেন। তাকে সহায়তা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন রায়াদী নামের এক অসহায় নারীকে। আর একটি মাত্র মেয়ের সহযোগিতা নিয়ে হাসান ইদরিস এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো। বরং বলা চলে, এক অসহায় নারী জীবন দিয়ে খৃস্টানদের অস্ত্রগার ও রসদভান্ডার ধ্বংস করে দিল।

মানুষকে ওই এলাকা থেকে দূরে রাখার জন্য যে দরবেশকে ওরা ব্যবহার করছিল হাতিয়ার হিসাবে, জাতির সাথে গাদ্দারী

করার শাস্তিও সে পেয়ে গেল সাথে সাথেই।

এই দরবেশ লোকদের বলেছিল, 'এই পাহাড়ের উপর বসে আমি মুশেলবাসীর জন্য প্রার্থনা করবো। আমি খোদার ইশারায় মুশেলের বাহিনীকে জানাবো অভিযানের সময়। আমার ইশারা মেনে নিলে মুশেলবাসীর বিজয় সূচিত হবে। তারা যে পথ দিয়ে যাবে সে পথই তাদের পদচুম্বন করবে। ইয়াজউদ্দিনের রাজ্য দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।' কিন্তু দরবেশের সে আশা আর পূরণ হলো না। খোদার ইশারা পাওয়ার আগেই খোদার গজব এসে তাকে পাহাড়ের সাথে মিশিয়ে দিল।

পরবর্তী দিনগুলো ছিল মুশেলবাসীর জন্য ভয়ানক আতংকের দিন। তাদের এ কথা বুঝানোর কেউ ছিল না যে, রাতের বিস্ফোরণ ও ভূকম্পনের কারণ কি ছিল।

প্রথম বিস্ফোরণের পর পরবর্তী বেশ কিছু দিন থেকে থেকে [illegible] বিস্ফোরণ চলতেই থাকলো। পাহাড় থেকে কালো [illegible] উঠে যেতো আকাশে। অনেক দূর থেকেও মানুষ সে ধোঁয়া দেখতে পেতো।

এর কারণ ছিল, পাহাড় ধ্বসের কারণে জায়গায় জায়গায় আটকা পড়ে [illegible] আগুন জ্বালানো পেট্রোল। ফলে সব জায়গায় একই সাথে পৌঁছতে পারেনি আগুন।

যখনই নতুন করে পেট্রোলকূপে আগুন লাগতো তখনই বিস্ফোরণ ঘটতো। তার সাথে পুড়তো গুহার মধ্যে রাখা আসবাবপত্র। পুড়তো জমানো খাদ্যভান্ডার। ফলে ভয়ে ও আতংকে সেদিকে যেতে কেউ সাহস পেতো না।

লোকজনের মনে পড়তো দরবেশের কথা। তারা সেই দরবেশকে ভন্ড ভেবে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য আফসোস করতে লাগলো। দরবেশের কেরামতি তাদের জন্য কল্যাণ নয়, বয়ে এনেছিল অভিশাপ। মুশেলবাসীর মনে তখন আতংক আর বেদনা।

এ অবস্থায় তারা একদিন শুনতে পেলো নতুন এক বাণী, 'ভন্ড পীর জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে ধ্বংস হয়েছে তার নিজের গড়া জাহান্নামের আগুনে।'

এ বাণী যিনি উচ্চারণ করছিলেন বেশভুষায় তিনিও এক দরবেশের মত। তার পরণে সবুজ রংয়ের জোব্বা। মাথার বাবড়ি চুল সবগুলোই সাদা। দাড়িও সাদা এবং লম্বা। চেহারায় বয়সের ছাপ স্পষ্ট। লোকটির এক হাতে লম্বা লাঠি অন্য হাতে কোরআন।

তিনিও আগের দরবেশের মতই হঠাৎ করে উদয় হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তাকেও আল্লাহ পাঠিয়েছেন এবং তিনিও আকাশ থেকে ইশারা পাবেন।

নতুন দরবেশের আগমনে মানুষ ভয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। তারা আবার দরবেশের ফাঁদে পা দেবে কিনা ভাবতে লাগলো। দরবেশ হাটে বাজারে বিভিন্ন সমাগমে ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলো, 'ভন্ড পীর জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে ধ্বংস হয়েছে তার নিজের গড়া জাহান্নামের আগুনে।'

লোকজন একজন দু'জন করে ভয়ে ভয়ে জমা হতে লাগলো তার পাশে। তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সে

জাহান্নামের আগুনকে ভয় করো, যা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। ভন্ড লোকের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো! ঐ কালো ধোঁয়া দেখো, আল্লাহর অভিশাপকে ভয় করো। এই কিতাবের কথা মানো, যে কিতাব আমার হাতে আছে। এটা আল্লাহর বাণী, এটা পবিত্র কোরআন!

কোন পীর দরবেশ তোমাদের মুক্তি দিতে পারবে না। তোমাদের মুক্তি সনদ এই কোরআন। কোরআনকে মানো, কোরআন তোমাদের সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তোমাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জামিন এই কোরআন। তোমরা কোরআন ছেড়ে মানুষের কাছে তোমাদের ভাগ্য তুলে দিয়েছিলে। তাই এই বিপর্যয় তোমাদের ঘিরে ধরেছে। এখনো সময় আছে, সাবধান হও। বাঁচতে হলে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নাও।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের সবকিছু খুলে বলুন!' এক বৃদ্ধ তার সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? ওই লোকটা কে ছিল? রাতে এমন বিস্ফোরণ ও ভূকম্পন কেন হলো? এই কালো ধোঁয়াই বা কিসের?'

'সে উন্মাদ! সে একটা বদ্ধ পাগল ছিল এমন কথা আমি তোমাদের বলতে পারি। কিন্তু তা সত্য নয়।' নতুন দরবেশ বললো, 'সে ছিল এক গাদ্দার আলেম। খৃস্টানরা তাকে পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল। তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য সে নানা কেরামতির কথা বলে বেড়াতো। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আল্লাহর গোপন রহস্যের খবর কেউ জানে না। আল্লাহ ছাড়া

বিজয়ের সুসংবাদ কেউ দিতে পারে না। জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা সবই আল্লাহর হাতে।
সে নিজেকে আল্লাহর দুত বলতো, কিন্তু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)ই ছিলেন আল্লাহর শেষ দুত। এরপর দুনিয়ায় আল্লাহর অনেক প্রিয় ব্যক্তি জন্ম নিতে পারে কিন্তু তারা কেউ আল্লাহর দুতের মর্যাদা পাবে না। তোমাদের বিভ্রান্ত করতে গিয়ে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হয়েছিল।
পাপিষ্ঠ আলেম তার দুনিয়ার শাস্তি পেয়েছে. পরকালের শাস্তি তো তার এখনো জমাই রয়ে গেছে। তোমরা সেখানে গিয়ে দেখো, তার একটি হাড্ডিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। সে যে পাহাড়ে বসেছিল সেই পাহাড়ও ধ্বংস হয়ে গেছে। কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, পাহাড় এখনো জ্বলছে। প্রতারক দরবেশকে যদি তোমরা সত্য বলে মানো তবে তোমরাও জ্বলবে। জ্বলবে দুনিয়ায়, জ্বলবে আখেরাতে।'
'আমাদের বলুন তবে সঠিক কে? আমরা কার কথা মানবো? কাকে বিশ্বাস করবো? তিনিও দরবেশ ছিলেন, আপনিও দরবেশ। কোন দরবেশকে আমরা সত্য বলবো?'
'না!' তিনি উত্তর দিলেন, 'উনি দরবেশ ছিলেন না, ছিলেন ভন্ড দরবেশ। আমিও দরবেশ নই, তোমাদের জন্য এক সামান্য সাবধানকারী মাত্র। চেহারা সুরত আর বেশ দেখে সত্য বিচার করো না। সত্য বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে এ কোরআন।'
তিনি কোরআন উঁচু করে ধরে বললেন. 'আল্লাহর এই বাণীই সত্য। তোমরা দরবেশের কথা ভুলে যাও। কোরআনকে যারা

মনগড়া ব্যাখ্যা করে তাদের কথা ভুলে যাও। যারা কোরআনের এক অংশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে আরেক অংশ গোপন করে তাদের কথা ভুলে যাও। কেবল এই কিতাবের কথা মান্য করো। মানো কোরআনের সব কথা।

এই কোরআন আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার বান্দাদের মঙ্গলের জন্য। মঙ্গল ও কল্যাণ কেবল এই কোরআনেই নিহিত আছে। কোন পন্ডিত, আলেম বা বুজুর্গানে দ্বীন এই কোরআনের সমকক্ষ হতে পারে না। আল্লাহর এই কালাম তোমাদের যে সৎ ও সত্য পথের সন্ধান দিতে পারবে কোন মানুষ তা দিতে পারবে না। তোমরা ব্যক্তি নয়, দল নয়, আঁকড়ে ধরো এই কোরআন। যে তোমাদের কোরআনের পথে পরিচালিত হতে বলবে, মেনে চলবে কেবল তার কথা।'

সারা দিন মুশেলে ঘুরে ঘুরে এই কথাই তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন। লোকজন কোথাও জমা হয়ে গেলে তিনি কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে তাদের নসিহত করতেন। তিনি বলতেন, 'অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি ছাড়া মানুষের কোন ক্ষমতা নেই আল্লাহর ইশারা সম্পর্কে কিছু বলে। আল্লাহর ইশারা সব লিপিবদ্ধ আছে কোরআনে। কোরআন পড়ে তোমরা সে ইশারা জেনে নাও।'

তিনি এক মসজিদে জোহরের নামাজ পড়লেন। নামাজের পর মুসল্লীরা তাকে ঘিরে ধরলো। তিনি তাদের সামনেও একই নসিহত করলেন। বললেন, 'আলেমদের কথা তোমরা শুনবে। তবে তা মানার আগে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করবে, তিনি

যে কথা বলেছেন তা বিবেক সম্মত কি না যদি নিজের বিবেক সায় দেয় তাহলেই তা মানবে, নচেৎ অন্য আলেমের কাছে যাবে সত্য আবিষ্কারের জন্য। তাকে বলবে তার কথার সপক্ষে কোরআনের আয়াত পেশ করার জন্য।

তার কথা বিবেক সম্মত না হলে যাবে অন্য আলেমের কাছে, যে তোমাকে কোরআন থেকে পথের দিশা দেখাতে পারবে। এভাবে কোরআন থেকেই তুমি তোমার পথের নিশানা জেনে নেবে।'

তিনি এশার নামাজের পরও এভাবে বক্তৃতা করে যখন মসজিদ থেকে বের হলেন তখন অনেক রাত। তিনি এক নির্জন স্থানে যাচ্ছিলেন, লোকেরাও তার পিছনে পিছনে চললো।

তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন আমার পিছনে আর কেউ আসবে না। আমি সারা রাত নির্জনে একাকী এবাদত বন্দেগী করবো। তোমাদের পাপের জন্যও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবো।'

তিনি জনগণের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন যে, জনগণের মন থেকে আগের দরবেশের ভয় ও শংকা দূর হয়ে গেল।

তিনি লোকজনকে থেমে যেতে বললে জনগণ সেখানেই থেমে গেল। তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লোকজন কেউ কেউ নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হলো, বাকীরা সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'এখন আমরা কি করি?'

লোকেরা তার পিছনে যাওয়ার সাহস পেলো না। কিন্তু এই জটলার মধ্যে এমন একজন ছিল, যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং চুপিসারে দরবেশের পিছু নিল।

দরবেশ বেশ কিছু দূর চলে গিয়েছিল। তাকে ধরার জন্য পেছনের লোকটি যখন দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তার পদধ্বনি বেড়ে গেল। নির্জন পথে সামান্য পদধ্বনিই দরবেশের কানে অনেক বড় হয়ে বাজলো। তিনি বুঝতে পারলেন, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তিনি থেমে পেছনে তাকালেন।

লোকটি অন্ধকারে দরবেশকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল। দরবেশ দাঁড়াতেই সে সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল এবং যাতে দরবেশের চোখে ধরা না পড়ে সে জন্য বসে পড়লো। দরবেশ কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার চলতে লাগলেন। কিন্তু আবারও তিনি অনুভব করলেন, কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তিনি বার বার পেছন ফিরে দেখলেন, কিন্তু অনুসরণকারীকে দৃষ্টিসীমায় দেখতে পেলেন না তিনি।

এভাবেই পথ চলছিলেন তিনি। শেষে কাউকে দেখতে না পেয়ে অনেকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাঁটা ধরলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর লোকটি চাপা পায়ে দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে দরবেশের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

দরবেশ উচ্চস্বরে কোরআনের আয়াত পাঠ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি দরবেশের কাছে পৌঁছেই

কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে আনলো। সে যখন পিছন থেকে দরবেশকে আঘাত করার জন্য উদ্যত তখনি দরবেশ কি মনে করে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালেন।

লোকটি খঞ্জর বাগিয়ে হাত দুটো সবে উপরে তুলেছিল কিন্তু তা নামিয়ে আনার আর সুযোগ পেলো না, দরবেশ ঘুরে দাঁড়িয়েই তার হাতের লাঠিটি এমনভাবে ঘুরালো যে, লোকটির খঞ্জর ধরা হাতের কব্জির উপরে জোরে আঘাত লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছিটকে পড়লো খঞ্জর। দরবেশ আততায়ীকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে তার পেট বরাবর জোরে লাথি চালালেন, লোকটি 'অক' শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ে গেল।

দরবেশের এক হাতে ছিল কোরআন, তাই এক হাতেই তাকে লড়াই করতে হলো। লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তিনি তার শরীর ও মাথায় কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন। মাথার আঘাতটি ছিল মারাত্মক, লাঠির আঘাতে লোকটির মাথা ফেটে গেল।

তিনি কয়েক কদম দূরে খঞ্জরটিকে ঝিলিক মারতে দেখলেন। কোরআন ও লাঠি এক হাতে নিয়ে অপর হাতে তিনি তুলে নিলেন ছুরিটি।

আঘাত খাওয়া লোকটি ধীরে ধীরে উঠে বসতে লাগলো। দরবেশ তাকে বললেন, 'খঞ্জর এখন আমার হাতে। চালাকি না করে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো।'

লোকটি উঠতে গিয়েও আর উঠলো না, পেটের ওপর ভর করে শুয়ে পড়লো।

দরবেশ মুখ দিয়ে পাখীর ডাকের মত শব্দ উচ্চারণ করলেন।

দূর থেকেও অবিকল সেই ডাকের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ডাকলেন।

অনতিদূরে অন্ধকারে দৌড়ানোর শব্দ শোনা গেল। দু'জন লোক মুহূর্তে দরবেশের কাছে ছুটে এলো। দরবেশ হেসে বললেন, 'আমি যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। এই হতভাগা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস সতর্ক ছিলাম।'

'আমি তো ভেবেছিলাম দিনের বেলায়ই মুশেলের কোন বাড়ীর জানালা থেকে আপনার দিকে তীর ছুটে আসবে।' আগন্তুক বললো, 'কিন্তু হতভাগারা সে সাহস করেনি।'

'ভেবেছিল, রাতের অন্ধকারে হত্যা করাটাই সুবিধাজনক। নাও, এখন শয়তানটার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করো।' দরবেশ খঞ্জরটি আগন্তুকের হাতে তুলে দিল।

'ওঠ শয়তান! তুই কি মুসলমান না খৃষ্টান?' আগন্তুক তার গায়ে একটি লাথি দিয়ে প্রশ্ন করলো।

'আমি মুসলমান!' লোকটি উঠে বসে বললো, 'হুজুর, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আসলে আপনাকে মারতে চাইনি। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম আপনি খাঁটি দরবেশ নাকি আগের হুজুরের মতই ভন্ড পীর। আপনি তো এক মহান বুজুর্গ।'

দরবেশ ও তার সঙ্গী দু'জনেই হেসে উঠলো। দরবেশ বললো, 'ফের চালাকি? আমাকে দরবেশ বা বুজুর্গ বলে পার পেতে চাস? আমি পীর নই আর বুড়োও নই, আমি তোর চেয়েও যুবক।'

'তোমার বহুরূপী সাজা সফল হয়েছে।' দরবেশের সাথী

বললো।

তিনজন মিলে সে লোককে দূরে এক তাবুর মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে চারটি উট বাঁধা। জায়গাটি এক পাহাড়ের ঢালে।

লোকটিকে তাবুর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে প্রদীপ জ্বলছিল। লোকটি কথিত দরবেশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দরবেশের চেহারার চামড়া আশি বছরের বুড়োর মত। বক্তৃতার সময় তার কণ্ঠও ছিল এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির। কিন্তু এখন তার কণ্ঠস্বর যুবকের মত ভরাট ও বলিষ্ঠ।

দরবেশ তার সাদা দাড়ি খুলে ফেললো। তার এক সঙ্গী তাকে একটি ভেজা কাপড় এনে দিল। দরবেশ সেই কাপড় দিয়ে তার মুখটা মুছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের বার্ধক্যের ছাপ মুছে গেল। সেখানে বেরিয়ে এলো এক তরতাজা যুবকের চেহারা। আক্রমণকারীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন দরবেশ।

'তুমি আসলে কে?' আক্রমণকারী জিজ্ঞেস করলো।

'একটু আগে আমি ছিলাম এক দরবেশ, যাকে তুমি হত্যা করতে চাচ্ছিলে।' তিনি বললেন, 'এবার তুমি বলো, তুমি কে? তোমাকে কে বা কারা আমাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছে? কোন কথা গোপন করার চেষ্টা করলে তার দায় দায়িত্ব তোমার। সে জন্য যদি তোমার মৃত্যুও হয়, আমাকে দায়ী করতে পারবে না।'

'আমার কাছে গোপন করার কিছুই নেই।' লোকটি উত্তর দিল। 'আমাকে মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের মহলের এক অফিসার আহমদ বিন উমরু বললো, 'শহরে এক নতুন দরবেশ

ঘোরাফেরা করছে। সম্ভবত সে ছদ্মবেশে আছে। তুমি তাকে অনুসরণ করো।'

তিনিই আমাকে বলেছেন, 'রাতের অন্ধকারে এই দরবেশকে হত্যা করতে হবে। কাজটা এমনভাবে সারবে যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে।'

'তাতে তোমার লাভ?'

'আহমদ বিন উমরু এ কাজের জন্য আমাকে অগ্রীম একশো দিনার দিয়েছে। কাজ শেষে আরো একশো দিনার দেবে।'

'আহমদ বিন উমরুর কি ধারনা, আমি এক জইফ দরবেশ?'

'তা আমি জানি না। তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেননি।'

লোকটি উত্তরে বললো, 'তিনি শুধু বলেছেন, বাজারের মোড়ে বা মসজিদে তুমি নতুন দরবেশকে পেয়ে যাবে। তাকে হত্যা করতে পারলে দুশো দিনার ইনাম পাবে।'

'আর তুমি আমাকে এক বৃদ্ধ মনে করে দুশো দিনারেই রাজি হয়ে গেলে!'

লোকটি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

দরবেশের রূপ ধারণকারী ও তাঁর সাথীরা ছিল সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বাহিনীর পরীক্ষিত সৈনিক। এরা তখন মুশেলে কাজ করছিল। আগের দরবেশের কারণে লোকদের মনে কুসংস্কার ঢুকে গিয়েছিল। কেরামতি ও অলৌকিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল মুশেলের অধিকাংশ জনগণ। লোকদের মন থেকে সেই কুসংস্কার দূর করার জন্যই আইয়ুবীর গোয়েন্দারা এই কৌশল নিয়েছিল। তারা সুলতান আইয়ুবীর

জানবাজদের মধ্য থেকে একজনকে দরবেশ বানিয়ে তাকে শহরে ছেড়ে দিল।

প্রথম দরবেশকে নিয়োগ করেছিল খৃষ্টানরা। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য ময়দানে নামিয়েছিল তাকে। 'বিষে বিষ ক্ষয়' নীতি অনুযায়ী সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারাও তাদের দলের এক যুবককে বুড়ো সাজিয়ে দরবেশের ছদ্মবেশে ময়দানে পাঠিয়ে দিল। তার কাজ হলো জনগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারনা তৈরী হয়েছে তা অপনোদন করা। তাই তিনি হাতে কোরআন নিয়ে জনগণকে সেই কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বললেন।

আহমদ বিন উমরু মুশেলে বিন উমরু নামেই বেশী খ্যাতিমান ছিল। মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিনের ব্যবস্থাপনা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল সে। তার পদমর্যাদা ছিল মন্ত্রীর সম পর্যায়ের।

কুটনীতিতে পারদর্শী এ লোক জানতে পারলো, মুশেলে নতুন এক দরবেশের আবির্ভাব হয়েছে। এই দরবেশ আগের দরবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং তাকে ভন্ড বলে আখ্যায়িত করছে।

তার বুঝতে বাকী রইলো না, এই লোক সুলতান আইয়ুবীর পক্ষ হয়ে ময়দানে নেমেছে। সে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারলে তাদের ষড়যন্ত্র সব বানচাল হয়ে যাবে। তাই সে এই দরবেশকে হত্যা করা জরুরী মনে করলো।

কিন্তু তার খুনের বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে তার প্রতি

মানুষের সহানুভূতি বেড়ে যাবে এবং তার পক্ষ হয়ে আবার কেউ মাঠে নামলে জনগণ তাকে লুফে নেবে। সে ক্ষেত্রে আগের দরবেশের আসল রূপ জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন জনগণ জেনে যাবে পাহাড়ে কি জ্বলছে। বিশেষ করে ইয়াজউদ্দিন যে খৃস্টানদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করেছে এবং তারই ছত্রছায়ায় তারা এখানে অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলেছিল তা আর গোপন থাকবে না।

সুলতান আইয়ুবীর এই ছদ্মবেশী দরবেশকে হত্যা করার জন্য সে মহলের প্রতিরক্ষা বিভাগের এক সৈন্যকে বাছাই করলো। দুইশত দিনারের লোভ দেখিয়ে দরবেশকে গোপনে হত্যা করার জন্য পাঠিয়ে দিল তাকে।

ভাড়াটে খুনী দরবেশকে দুর্বল এক বৃদ্ধ মনে করে কাজটা সহজেই সারতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু আসলে সে যে যুবক এবং আইয়ুবীর গোয়েন্দা ও কমান্ডো দলের এক চৌকস যোদ্ধা এ কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। ফলে দরবেশকে খুন করতে এসে সে নিজেই ফেঁসে গেছে।

বিন উমরুর পাঠানো এই খুনীকে প্রদীপের আলোয় বসিয়ে জেরা করা শুরু করলো আইয়ুবীর গোয়েন্দারা। তাকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করা হলো, কিন্তু তার কাছে আসলে তেমন কোন গোপন তথ্য ছিল না। সে এক সাধারণ নিরাপত্তা কর্মী, সৈনিক হলেও গোয়েন্দা বিভাগের লোক না হওয়ায় সে নিরাশ করতে বাধ্য হলো আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের

আইয়ুবীর গোয়েন্দারা বুঝলো, এ লোক এক ভাড়াটে খুনী মাত্র,

টাকার লোভে খুন করতে এসে ফেঁসে গেছে। ফলে তাদেরকে দেয়ার মত কোন তথ্য তার কাছে নেই।

দরবেশের ছদ্মবেশধারী লোকটি তার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। তিনজনের মাঝে চোখে চোখে কথা হলো। এ কথার কিছুই বুঝলো না আততায়ী কিন্তু ততোক্ষণে তার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

দরবেশধারী লোকটির চোখের ভাষা পড়ে দলের একজন উঠলো এবং তাবুর এক কোণা থেকে এক টুকরো রশি নিয়ে আততায়ীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভাড়াটে খুনী কিছু বুঝে উঠার আগেই সে পিছন থেকে দ্রুত তার গলায় শক্ত করে রশি পেঁচিয়ে ধরে টান দিল। লোকটি কিছুক্ষণ ছটফট করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো চিরদিনের মত।

পরেরদিন।

আহমদ বিন উমরু ও মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিন মহলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আহমদ বিন উমরুর চেহারা থেকে অস্থিরতা ও পেরেশানী ঝরে পড়ছিল আর ইয়াজউদ্দিনের চেহারায় খেলা করছিল রাগ ও ভয়।

আহমদ বিন উমরুর হাতে একটি কাগজের টুকরো কাগজটি সে পেয়েছে তার পাঠানো সৈনিকের লাশের সাথে। লাশটি উমরুর বাড়ীর ফটকে পড়েছিল। লাশের গলায় রশি বাঁধা, আর সে রশির সাথে আটকানো ছিল এই চিঠি।

চিঠিটি হাতে নিয়ে ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তুমি বলছো, নিহত

লোকটি মহলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন সৈনিক ছিল? এই সৈনিককে তুমি নতুন দরবেশকে গোপনে রাতের অন্ধকারে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলে?'

বিন উমরু মাথা নত করে বললো, 'সারা রাত আমি এই সৈন্যের জন্য না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। সকালে খবর পেলাম, আমার বাড়ীর ফটকের সামনে একটি লাশ পড়ে আছে। আমি দ্রুত বাইরে এসে মাটিতে এই সৈনিকের লাশ দেখতে পাই। লাশের চোখ ছিল বিস্ফারিত এবং তার জিহবা বের হয়ে এসেছিল। গলার ফাঁস দেয়া রশির সাথে আটকানো ছিল এই চিঠি।'

'তুমি পড়েছো এতে কি লেখা আছে?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন ইয়াজউদ্দিন।

'অবশ্যই মহামান্য আমীর! তাই তো আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

এই চিঠিতে লেখা ছিল, 'মুশেলের সম্মানিত আমীর ইয়াজউদ্দিন মাসুদ! আপনার এক বড় অফিসার ও উপদেষ্টা আহমদ বিন উমরু এ লোককে পাঠিয়েছিল আমাকে খুন করতে। আমি তার লাশ স্বসম্মানে ও যত্নসহকারে আহমদ বিন উমরুর বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।

এই হতভাগা সৈনিক আমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এটা তার দোষ নয়। আমরা এতটাই সতর্ক যে, এ ধরনের হামলার জন্য আমরা সব সময়ই প্রস্তুত থাকি। তাই খুব ঝানু ও আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ কাউকে না পাঠালে এ ধরনের ব্যর্থতা

ছাড়া তারা আপনাকে কিছুই দিতে পারবে না।

সম্মানিত আমীর! আপনার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেই বলছি, আপনি তো সেই হতভাগাদের একজন, যারা সকাল সন্ধ্যা সুলতান আইয়ুবীর ক্ষতির স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টারও কোন ত্রুটি করে না। কিন্তু অতীতে যেমন আপনার স্বপ্ন সফল হয়নি তেমনি ভবিষ্যতেও আপনি বা আপনার মত বেঈমানরা ইনশাআল্লাহ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সম্মানিত আমীর! মনযোগ দিয়ে আমার কথা শুনুন। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব আপনাকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। আরও জেনে রাখুন, এখন থেকে আমরাও আর আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবো না।

আপনার লোকেরা আমাদের লাশ করার জন্য যখন আমাদের ওপর আঘাত হেনেছে তখন আপনিও জেনে রাখুন, এখন থেকে আমরাও আপনাকে লাশ বানানোর জন্য প্রস্তুত হবো। যেভাবে আপনার উপদেষ্টার পাঠানো সৈনিকের লাশ পড়েছিল রক্তপিপাসু উপদেষ্টার বাড়ীর ফটকে, তেমনি কোনদিন হয়তো দেখবেন আপনার লাশ পড়ে আছে আপনার আরামদায়ক নরম বিছানায়।

তবে আমরা আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আমরা জানি কারা খৃস্টানদের বন্ধু। আহমদ বিন উমরুর মত খৃস্টানদের যারা বন্ধু তাদেরকে উপদেষ্টা বানিয়ে আপনি বাঁচতে পারবেন না। এখনও সময় আছে, আপনার অফিসারের মধ্যে যারা

খৃস্টানদের বন্ধু তাদের সংশ্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন। খৃস্টানদের বন্ধু তোষামোদী চাটুকারের দল কখনও আপনার কল্যাণকামী ও অনুগত হতে পারে না। এরাই আপনার ধ্বংসের কারণ হবে।

আমাদের শক্তি সম্পর্কে কোন ভুল ধারনায় থাকা ঠিক হবে না আপনার। আপনার সামরিক উপদেষ্টা ও বন্ধু এহতেশাম উদ্দিনকে আপনি বৈরুত পাঠিয়েছিলেন খৃষ্টানদের সাথে গোপন চুক্তি করতে। কিন্তু আমরা তাকে উধাও করে দিয়েছি। এখন তিনি সুলতান আইয়ুবীর কাছে আছেন।

আপনার খৃষ্টান বন্ধুরা পাহাড়ের গুহায় যে বিশাল যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও আগ্নেয়াস্ত্র পুঞ্জিভূত করে রেখেছিল, আমরা তার সবটাই ধ্বংস করে দিয়েছি। পুঞ্জিভূত সমরাস্ত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে গিয়ে আমরা না চাইলেও পাহাড় ধ্বস ও ভূমিকম্পের যে ধাক্কা খেয়েছে মুশেলবাসী তাতে তারা আতঙ্কিত। এখনো খৃস্টানদের এই অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্রয় ও সহযোগিতার কথা মুশেলবাসীকে বিস্তারিত আমরা জানাইনি। যদি মুশেলবাসী আপনার কুকর্মের কথা জানতে পারে তাহলে আপনার অবস্থা কি হবে এটুকু বুঝার মত বুদ্ধিও কি আল্লাহ্ আপনাকে দেয়নি?

শুনে রাখুন সম্মানিত আমীর! আপনাদের পাঠানো খুনীদের লাশ আমরা আপনার হুশ ফিরিয়ে আনার জন্য আপনার লোকদের হাতে এবার তুলে দিলেও ভবিষ্যতে এতটা কষ্ট করার সময় ও সুযোগ আমাদের হবে না। এখন থেকে আমরা অশরীরি জ্বীন

ভুতের মতই আপনার চার পাশ পাহারা দেবো। আপনারা আমাদের দেখতে পাবেন না, কিন্তু আমরা আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাসের খবরও আপনাকে বলে দিতে পারবো।

সম্মানিত আমীর! আপনার ধ্বংসের প্রক্রিয়া কেবল শুরু হয়েছে। যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শখ না থাকে তবে সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য মেনে নিয়ে তার হাতে আপনার সৈন্যদের তুলে দিন। এই আত্মসমর্পনে আপনার অপমান বোধ করার কোন কারণ নেই। বরং অতীত পাপের কাফফারা আদায়ের এই সুযোগকে লুফে নিতে পারায় আপনার গর্ব করা উচিত।

সম্মানিত আমীর! মুসলমানদের প্রথম কেবলা মুক্ত করার জন্য যে মুজাহিদরা মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধেছে তাদের পথ রোধ করার ফন্দিফিকির বাদ না দিলে তার পরিণতির জন্য আমরা নই, আপনিই দায়ী থাকবেন। এই দুনিয়ার বাদশাহী ও শান শাওকত ত্যাগ করে যে দ্বীনের খাদেম হতে পেরেছে জীবন তো কেবল তারই সফল হয়। রাজ্য ও সিংহাসন কখনো করো সঙ্গে যায় না এ কথাটি মনে রাখলে খুশী হবো।

ইতি আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী অচেনা পথিক।'

আহমদ বিন উমরু লাশটি তার ঘরের সামনে থেকে সরিয়ে ইয়াজউদ্দিনের মহলের সামনে নিয়ে এসেছিল। ইয়াজউদ্দিন এই চরমপত্র পড়ে পত্রটি বিন উমরুর হাতে দিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। বিন উমরুর চেহারায় তখনো খেলা করছিল রাগ, কিন্তু ইয়াজউদ্দিনের রাগ, ক্ষোভ ও উদ্দীপনা সবই শিথিল

হয়ে গিয়েছিল।

'আমি সংবাদ পেয়েছি, মসজিদে মসজিদে এই নতুন দরবেশকে নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে।' বিন উমরু ইয়াজউদ্দিনকে লক্ষ্য করে বললো, 'এই লেখায় প্রমাণ হয়ে গেল, এ লোক কোন দরবেশ নয় বরং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কোন জাঁদরেল গোয়েন্দা।'

সে কাগজটি মুড়ে লাশের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'আমি তাকে খুঁজে বের করবো এবং সর্ব সাধারণের সামনে প্রকাশ্যে তাকে হত্যা করবো। এতে জনতা ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনার ব্যাপারে কোন বাঁকা মন্তব্য করার আগে দশবার ভাবতে হবে এ ধরনের লোককে।'

'সস্তা উত্তেজনা প্রকাশের সময় এটা নয় বিন উমরু। ফালতু আবেগ রেখে ঠান্ডা মাথায় সব কিছু চিন্তা করতে হবে।' ইয়াজউদ্দিন মাসুদ বললেন, 'তুমি বড়জোর ঐ একটি লোককে হত্যা করতে পারবে। তাতে সুলতান আইয়ুবীর কি ক্ষতি হবে? কিছুই না। আমাকে নতুন করে সবকিছু চিন্তা করতে হবে।'

'এহতেশামউদ্দিন আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে। সে খৃস্টানদের সাথে আপনার পক্ষে সন্ধি না করে আইয়ুবীর কাছে চলে গেছে। এ জন্যই ওদের এত সাহস বেড়ে গেছে। আপনি আমাকে সুযোগ দিন। আমি সম্রাট বিলডনের কাছে যাবো। তাকে বলবো আইয়ুবীর ওপর এখনই আঘাত হানতে। বিনিময়ে তার সব শর্ত আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।'

'আমি তো চেয়েছিলাম খৃস্টানরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর উপর

আক্রমণ করুক। কিন্তু জানিনা কেন তারা অগ্রসর হচ্ছে না। তাদের তৎপরতায় মনে হচ্ছে, তারা চায়, আমি সালাহউদ্দিনের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি। তখন তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তারা এমনভাবে সাহায্য করবে, যাতে তাদের কমান্ডো বাহিনী সালাহউদ্দিনের পার্শ্বদেশ ও পিছন থেকে আক্রমণ করে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। তারা আইয়ুবীর রসদ সামগ্রী রাতের আঁধারে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাবে কিন্তু প্রকাশ্য ময়দানে আইয়ুবীর বাহিনীর সামনে আমাকেই লড়াই করতে হবে। এটা অসম্ভব। যদি তারা সরাসরি যুদ্ধে নামতো তবে না হয় কথা ছিল।'

'তারা প্রকাশ্যেই যুদ্ধে নামবে। আমাকে সুযোগ দিন, সে ব্যবস্থা আমিই করবো।' বিন উমরু চোখে মুখে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বললো।

ইয়াজউদ্দিনের ঠোঁটে দেখা দিল তিক্ত হাসি। তিনি বিন উমরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই চিঠিতে একটা সত্য কথা লিখেছে। বলেছে, তুমি একজন তোষামোদী।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'আমি এক মহা সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছি আর তুমি আমাকে খুশী করার জন্য শিশুর মত কথা বলছো। তুমি কি এরচে ভাল কোন পরামর্শ দিতে পারো না?'

তিনি থামলেন এবং তালি বাজালেন। মহলের এক রক্ষী দৌড়ে এলো তার কাছে। মাথা নুইয়ে বললো, 'জাঁহাপনা!'

ইয়াজউদ্দিন তাকে বললেন, 'দারোয়ানকে বলো, লাশটি এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে কোথাও দাফন করে আসুক।'

এই কথা বলে তিনি তার খাস কামরার দিকে হাঁটা ধরলেন। আহমদ বিন উমরু কি করবে ভেবে না পেয়ে ইয়াজউদ্দিনের পিছন পিছন চলতে লাগলো।

তিনি খাস কামরায় ঢুকে দাসীকে বললেন, 'মদের সুরাহী ও পিয়ালা নিয়ে এসো, দারোয়ানকে বলো যেন কেউ এদিকে না আসতে পারে।'

আহমদ বিন উমরু ইয়াজউদ্দিনের খাস কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাসী দারোয়ানকে খবর দেয়ার জন্য কামরা থেকে বেরিয়েই লাশটি দেখে ভয় পেয়ে গেল। তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো লাশের পাশে পড়ে থাকা দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজটির উপর।

দাসী আরবী পড়তে পারতো, সে কাগজটি তুলে দু'লাইন পড়েই তা আঁচলের নিচে লুকিয়ে ফেললো এবং দ্রুত আবার কামরার মদের ভাঁড়ারের দিকে চলে গেল।

সে ইয়াজউদ্দিনের হাতে মদের পেয়ালা তুলে দিয়ে দৌড়ে আবার বাইরে এলো। দারোয়ানকে বললো, 'লাশ উঠিয়ে দাফন করে দাও।' বলেই সে আবার খাস কামরায় ঢুকে গেল।

'আরমেনিয়ার শাহ আরমান আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে।' ইয়াজউদ্দিন বিন উমরুকে বললেন, 'তিনি আমাকে তার রাজধানী আল খালিদে সাক্ষাতের পরিবর্তে হারজামে দাওয়াত করেছেন। তিনি আল খালিদ থেকে যাত্রা করেছেন। আমিও তার সাথে সাক্ষাতের জন্য দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা করতে

চাচ্ছি।'

দাসী পিয়ালায় মদ ঢালার পরিবর্তে মনোযোগ দিয়ে পিয়ালা মুছতে লাগলো। তার কান ইয়াজউদ্দিনের কথার দিকে নিমগ্ন। 'আমার মনে হয় আরমেনিয়ার শাহ্ আরমান আল খালিদ থেকে হারজাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভীষণ ভুল করছে।' বিন উমরু বললো, 'আমি খবর পেয়েছি, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আল খালিদের দিকে অভিযান চালাচ্ছেন।'

ইয়াজউদ্দিন মাসুদ বললেন, 'তুমি কি এই ভয় পাচ্ছো যে, শাহ আরমানের অনুপস্থিতিতে সুলতান আইয়ুবী আল খালিদ অবরোধ করে দখল করে নেবে? আমার মনে হয়, এমনটি হবে না। আর যদি তাই ঘটে, তবে আমরা সম্মিলিতভাবে সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনীর উপর পিছন থেকে চড়াও হবো। আমরা যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে খৃষ্টানদের সংবাদ পাঠাবো। ' অবস্থায় তারা সালাহউদ্দিনের উপর আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করবে না। আমার বিশ্বাস, ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনী একদম পিষে যাবে।'

'আপনি কবে যাচ্ছেন?' বিন উমরু প্রশ্ন করলো।

'পরশু নাগাদ রওনা করতে চাই।' ইয়াজউদ্দিন উত্তর দিলেন।

দাসী পিয়ালায় মদ ঢেলে দু'জনকেই তা পরিবেশন করলো। মদ পরিবেশন শেষ হলে ইয়াজউদ্দিন তাকে বললো, 'এবার তুমি একটু বাইরে যাও।'

সে মদের বোতলের মুখ বন্ধ করে পাশের কামরায় চলে গেল। জানালা দিয়ে দেখতে পেলো কয়েকজন সৈনিক ধরাধরি

করে বারান্দা থেকে লাশটি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
দাসী তার কামরা থেকে সরে যেতে পারছিল না। কারণ এখন সে ডিউটিতে আছে। যে কোন সময় ইয়াজউদ্দিন তাকে ডেকে বসতে পারে। সে সেখানেই বসে থাকলো এবং চিন্তা করতে লাগলো।
হঠাৎ তার মুখ থেকে 'উহ্' শব্দ বের হলো। সে দুই হাতে পেট চেপে ধরে কাতরাতে লাগলো। ব্যথার চোটে সে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পেট চেপে ধরে বসে পড়লো। দারোয়ান ও অন্যান্য দাসী চাকররা দৌড়ে এলো। দাসী চেহারায় চরম কষ্ট ফুটিয়ে তুলে বললো, 'পেটে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে।'
ডিউটিতে অন্য দাসীকে বসিয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসক তাকে ঔষুধ দিয়ে বললো, 'এখন তুমি ডিউটি করার যোগ্য নও। আমি লিখে দিচ্ছি, তুমি দু'দিনের জন্য ছুটি নাও।'
কিছুক্ষণ পর তার পেটের ব্যথা সামান্য কমলো। ডাক্তারের দেয়া কাগজ দেখিয়ে সে দু'দিনের ছুটি চাইলো। তার ছুটি মঞ্জুর করা হলো সে ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে বাড়ী যাওয়ার পরিবর্তে ইয়াজউদ্দিনের বিবি রাজিয়া খাতুনের কামরার দিকে হাঁটা ধরলো।
রাজিয়া খাতুন সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর স্মৃতি বুকে নিয়ে ইয়াজউদ্দিনের ঘর করছিলেন। কিন্তু যে আশা নিয়ে তিনি ইয়াজউদ্দিনের মহলে এসেছিলেন তার সে আশা পূরণ হয়নি। ইয়াজউদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর বন্ধু ও সাথী না হয়ে শত্রুই রয়ে

গেল।

মুসলমান আমীরদের ঐক্যবদ্ধ করে ফিলিস্তিন থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করার যে স্বপ্ন নুরুদ্দিন জঙ্গী দেখেছিলেন এবং এখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দেখছেন, তা আর বাস্তবায়িত হলো না।

ইয়াজউদ্দিন রাজিয়া খাতুনকে বিয়ে করেছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। দামেশক ও বাগদাদে রাজিয়া খাতুনের যে প্রভাব ছিল তাকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করাই ছিল তার মূল টার্গেট।

ইয়াজউদ্দিনের ভয় ছিল, এই মহিয়সী নারীকে কব্জা করতে না পারলে তাকে সুলতান আইয়ুবী ব্যবহার করবে। তাতে সুলতানের শক্তি ও প্রভাব অনেক বেড়ে যাবে। আর যদি তাকে বিয়ে করে একবার মহলে ঢুকানো যায় তবে দামেশক ও বাগদাদের লোকজন তার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

রাজিয়া খাতুন বিয়ের পর পরই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। প্রথমে তিনি বিদ্রোহ করলেও পরে তিনি তার কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তিনি বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন, ইয়াজউদ্দিনের আস্থা অর্জন করে তিনি আইয়ুবীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করতে শুরু করেন।

মুশেলে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি গোপনে মহলের সব গোপন খবর তাদের সরবরাহ করতে লাগলেন। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করতে লাগলো তার পূর্ব স্বামী নুরুদ্দিন জঙ্গীর কন্যা শামুসুন নেসা।

মা ও মেয়ে উভয়েই সুলতান আইয়ুবীর কাছে অতি মূল্যবান গোপন তথ্য পাঠাতে লাগলো। সেই সঙ্গে রাজিয়া খাতুন

ইয়াজউদ্দিনের দুই সেনাপতি ও একজন উপদেষ্টাকেও নিজের সহযোগী বানিয়ে নিলেন।

ইয়াজউদ্দিনের সাথে তার মতভেদ ও বিবাদ বাঁধলে ইয়াজউদ্দিন তাকে গৃহবন্দী করে ফেলেন। ফলে তিনি ইয়াজউদ্দিনকে এ আশ্বাস দিতে বাধ্য হন যে, তিনি সুলতান আইয়ুবীর পক্ষে আর কথা বলবেন না।

রাজিয়া খাতুন ছিলেন মধ্য বয়সী সুন্দরী মহিলা। তিনি ইয়াজউদ্দিনকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে তাঁর মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিলেন। এরপর তিনি মনযোগ দিলেন মহলের ভেতরে আইয়ুবীর সপক্ষে গোয়েন্দা দল তৈরী করতে।

রাজিয়া খাতুন তাঁর কামরাতেই বসেছিলেন। ইয়াজউদ্দিনের দাসী প্রবেশ করলো কামরায়। বললো, 'পেটের ব্যথার ছলনা করে এখানে এসেছি! ডাক্তার আমাকে দু'দিনের ছুটি নিতে বলেছে। ছুটি নিয়েই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'কি ব্যাপার! কোন জরুরী খবর?' রাজিয়া খাতুন উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

দাসী তার জামার মধ্য থেকে কাগজের সেই চিঠিটা বের করলো যেটা সে লাশের পাশে পেয়েছিল। চিঠিটি রাজিয়া খাতুনের হাতে দিতে দিতে বললো, 'এই চিঠিটি এক সৈনিকের লাশের সাথে বাঁধা ছিল।'

রাজিয়া খাতুন চিঠিটা পড়লেন ও বললেন, 'সাবাস! আমাদের মুজাহিদরা ভালই কাজ করছে। খুশীর কথা হলো, এই হতভাগা আমাদের লোকদের হত্যা করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।

আমি খবর পেয়েছি, আমাদের দরবেশ জনগণের মন থেকে খৃস্টান দরবেশের আতংক ও গুজবের ভীতি দূর করতে সক্ষম হয়েছে।'

'এ লেখা তারই।' দাসী বললো, 'আমি তার হাতের লেখা চিনি।'

রাজিয়া খাতুন হেসে বললেন, 'আমি জানি তুমি শুধু তার হাতের লেখাই চেনো না, মনের ভাবও পড়তে জানো। কিন্তু সাবধান! তাকে তোমার মনের জালে বন্দী করতে যেও না। আগে নিজের দায়িত্ব পালন করো এবং তাকেও তার দায়িত্ব পালন করতে দাও।'

রাজিয়া খাতুনের এ কথায় দাসী লজ্জা পেলো। সে লাজ রক্তিম কণ্ঠে বললো, 'না, এখনও ফরজ কাজের চেয়ে মনের আবেগকে প্রাধান্য দেইনি। আমি ফাহাদকেও সে কথা বলেছি, 'তোমার প্রতি আমার অন্তরের যে টান আছে তার চাইতে আমাদের দায়িত্ব অনেক বড়। আমাকে পেতে হলে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করো।'

ফাহাদ সেই তরুণ যুবকের নাম, যে নতুন দরবেশের রূপ ধারণ করে ইতিমধ্যেই ইয়াজউদ্দিনের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই যুবক বাগদদের বাসিন্দা। তার মধ্যে গোয়েন্দগিরীর গুণাবলী ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। এই সুদর্শন যুবক, দুই বছর ধরে মুশেলে বসবাস করছে এবং সফলতার সাথে গোয়েন্দাগিরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার সবচে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে, কণ্ঠের যাদু। সে অত্যন্ত সহজে ও

মনোমুগ্ধকর ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারতো। এ ক্ষেত্রে সে তার সঙ্গীদের চেয়েও এগিয়ে ছিল।

এই গোয়েন্দাগিরী কাজের সূত্র ধরেই ইয়াজউদ্দিনের এক সুন্দরী দাসীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তারপর কখন কিভাবে যে একে অপরের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে নিজেরাই জানে না।

দাসী এই শহরেরই বাসিন্দা। কিন্তু তার অধিকাংশ সময় মহলের কাজেই অতিবাহিত হয়ে যায়। ইদানিং গোয়েন্দাগিরীর গোপন কাজ ছাড়াও ফাহাদের সাথে তার মাঝেমধ্যেই সাক্ষাৎ হতে থাকে।

'আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি তা তো বলাই হয়নি।' দাসী রাজিয়া খাতুনকে বললো, 'ইয়াজউদ্দিন আগামী পরশু শাহ আরমানের সাথে দেখা করার জন্য হারজাম যাচ্ছেন।'

'তুমি কেমন করে জানলে এ খবর?'

'আমি মদ পরিবেশন করার সময় তাঁর মুখে এই কথা শুনেছি। তিনি আহমদ বিন উমরুকে বলছিলেন, 'শাহ আরমান আমার চিঠির জবাব দিয়েছে। তিনি আমাকে তার রাজধানী আল খালিদে দাওয়াত না দিয়ে হারজাম যেতে বলেছেন। আগামী পরশু আমি হারজামের দিকে রওনা করবো।'

এ খবর আপনাকে জানানোর জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি সেখান থেকে বের হতে পারছিলাম না। শেষে পেটের ব্যথার ভান করে ছুটি নিয়ে আপনার কাছে চলে

এলাম।'
রাজিয়া খাতুন খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠলেন। বললেন, 'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখন আল খালিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমি জানি না আল খালিদে নিজেদের কোন গোয়েন্দা আছে কিনা এবং তারা এ সংবাদ সুলতানকে দিয়েছে কিনা। কিন্তু আমি মনে করি, এ সংবাদ সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে এখনি পৌঁছা দরকার। তাতে সুবিধা হবে, এ খবর পেলে সুলতান আইয়ুবী দু'জনকেই হারজামে ধরে ফেলতে পারবেন। তুমি এক কাজ করো। ফাহাদ কিংবা তার কোন সাথীকে এ খবর পৌঁছে দাও। তাদেরকে বলো, সুলতান আইয়ুবী এখন আল খালিদের পথে। তারা যেন এ খবর সুলতানকে পৌঁছে দেয়।'
তিনি দাসীকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'যাও, দেরী করো না, এক্ষুণি যাও।' দাসী সেখান থেকে বিদায় নিল।
দাসী বিদায় নেয়ার কিছুক্ষণ পরই ইয়াজউদ্দিন মাসুদ রাজিয়া খাতুনের কামরায় প্রবেশ করলেন। তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। রাজিয়া খাতুন একটু আগে দাসীর মুখে যে খবর শুনেছেন তার ভয় ও অস্থিরতার সেটাই যে কারণ বুঝতে পারলেন তিনি। তবুও নিজেকে আড়াল করে তিনি তাকে এই অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।
'আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শত্রুতা আর খৃষ্টানদের বন্ধুত্বের যাঁতাকলে পিষে মরছি।' ইয়াজউদ্দিন মাসুদ অসহায়ের মত কথাগুলো বলেই ধপ করে এক আসনে বসে পড়লেন।

'আমার যাবতীয় আনন্দ ও খুশী শুধু আপনার সাথে।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'কিন্তু আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পক্ষে কথা বললে আপনি সন্দেহ করেন, আমি বুঝি তাঁর পক্ষে আর আপনার বিরুদ্ধে।

এ জন্যই এখন আর রাজনীতি নিয়ে আমি আপনাকে কিছু বলি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার পেরেশানীর কারণ এটা নয় যে, সালাহউদ্দিনের সাথে আপনার শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। আসল কারণ হচ্ছে, আপনি সেই জাতিকে বন্ধু মনে করছেন, যে জাতি আপনার বন্ধু হতে পারে না।

আপনি তাদের বন্ধু ভাবলেও তারা আগেও মুসলমানকে বন্ধু ভাবেনি, এখনো ভাবছে না এবং ভবিষ্যতে ভাববে এমন কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না। খৃষ্টানরা তাদের পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে কিন্তু আপনাকে তারা ধোঁকা দেবে। আপনি এক বিপদজনক শত্রুকে বন্ধু ভেবে বসে আছেন।'

'তবে কি আমি সালাহউদ্দিনের পায়ের তলে তলোয়ার রেখে দিয়ে বলবো, আমাকে একটু আশ্রয় দিন?' ইয়াজউদ্দিন বিরক্তি নিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি এমনটা করলে মানুষের কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? আমার সৈন্যবাহিনী তার হাতে তুলে দিয়ে কেমন করে আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আপনাকে প্রজা বানাতে চান না। তিনি বরাবরই আপনাকে তাঁর জোটভুক্ত হতে আহবান জানিয়েছেন।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'আইয়ুবীর সাথে জোটবদ্ধ হলে তাতে তো আপনার সম্মানহানির কিছু দেখি না আমি।'

'তুমি তার মনের ভাব জানো না।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের কথা বলে নিজেই এক সাম্রাজ্যের মালিক হতে চান।'

'এর অর্থ হলো, আপনি তার সাথে যুদ্ধ করবেন।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'যদি এটাই হয় আপনার ইচ্ছা তবে পেরেশান হওয়ার পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। নিজের সৈন্য বাহিনীতে আরও সৈন্য বৃদ্ধি করুন। তাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তুলুন। বীর কখনো পেরেশান হয় না, নিজের যোগ্যতা ও সাহস নিয়ে লড়াই করে।'

'আমার অশান্তি শুধু এই যে, সুলতান সালাহউদ্দিনের গোয়েন্দারা এই মুশেলেও তাদের জাল বিছিয়ে রেখেছে।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তুমি তো জানো আমার সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দিন বৈরুতে সম্রাট বিলডনের সাথে চুক্তি করতে গিয়েছিল, কিন্তু সে সেখান থেকেই অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে আমি সংবাদ পেয়েছি, সে এখন সালাহউদ্দিনের কাছে। আমার যাবতীয় গোপন তথ্য তার কাছে রয়েছে। আমি খৃষ্টানদের কাছ থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র, পেট্রোল, তেলের মটকা ও বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামের ভান্ডার এনে আমার কাছে জমা করেছিলাম, সেগুলো তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ আমার রক্ষী বাহিনীর এক সৈন্যের লাশ আমার কাছে এসেছে।'

'তাকে কেউ হত্যা করেছে?' রাজিয়া খাতুন না জানার ভান করে প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তাকে কেউ হত্যা করেছে।

তাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠানো হয়েছিল। তাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কোন কমান্ডো হত্যা করেছে।'

সে লাশের সাথে ফাহাদের লেখা যে চিঠি ছিল ইয়াজউদ্দিন জানতো না সে চিঠি এখন রাজিয়া খাতুনের কাছে। রাজিয়া খাতুন চিন্তা করলেন, ইয়াজউদ্দিন এখন যথেষ্ট ভীত ও আতংকগ্রস্ত। তাকে আরো ভীত সন্ত্রস্ত করা উচিত।

'আপনি তো ভাল করেই জানেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শুধু যুদ্ধের ময়দানেই লড়াই করেন না।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'তিনি যখন তার তাবুতে শুয়ে থাকেন তখনও তাঁর শত্রুরা মনে করে তিনি তাদের মাথার উপর বসে আছেন। এখন তো তিনি আল খালিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি মুশেলেই বসে আছেন এবং তার নির্দেশেই কমান্ডোরা এই ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

খৃষ্টানদের সৈন্য সংখ্যা হিসাব করুন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যের দশগুণেরও বেশী হবে। কিন্তু খৃষ্টানরা তবু আগে তাকে আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না। খৃষ্টানদের তুলনায় আপনার কি পরিমাণ সৈন্য আছে তা তো আপনিই ভাল জানেন। আমার ভয় হয়, আপনার বাহিনীর সেনাপতি ও কমান্ডাররা সবাই আপনার অনুগত ও বাধ্য নয়। তাদের মধ্যেও আইয়ুবীর লোক আছে। তারা চূড়ান্ত সময় এলে আপনাকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে। এমনকি দল বদল করে আইয়ুবীর বাহিনীতেও শামিল হয়ে যেতে পারে। এসব সম্ভাবনা আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। যুদ্ধে জিততে হলে সব সময় কোন কোন দিক

থেকে বিপদ আসতে পারে তা জানা থাকতে হয় একজন সেনাপতির। তাহলেই তো কেবল তিনি তার মোকাবেলা করতে পারেন।'

ইয়াজউদ্দিন এ কথায় সত্যি সত্যি আরও ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'আমি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখান থেকে সহজে ফিরে আসা সম্ভব নয়। আমি পরশু মুশেল থেকে একটু বাইরে যাবো। যদি অবস্থা আমার অনুকূলে থাকে তবে হয়তো সফল হবো।' তিনি থামলেন এবং গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'রাজিয়া! তোমার কাছে আমার একটি জিনিস চাইবার আছে।'

'কি জিনিস!' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'আপনি আমার কাছে যা চাবেন, তাই পাবেন। যদি আপনি আমাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বলেন, তাও আমি করতে পারবো। আমি এখন আপনার এক সন্তানের মা। আমার ভাগ্য এখন আপনার সাথে একাকার হয়ে গেছে। আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে? আপনার সব আশা আমি পূরণ করে দেবো।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করো না, আমি কোথায় যাচ্ছি? এ কথা এখন গোপন রাখাই ভাল। তবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর অভিপ্রায় নিয়েই যাচ্ছি আমি।

যদি আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে আমি তোমার কাছে আশা করবো, তুমি আমার পক্ষ থেকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাবে

এবং তার সাথে আমার বিরোধ মীমাংসা করে দেবে। এমনও হতে পারে, আমি একা গেলে তিনি আমার সাথে দেখাও করবেন না। তাই তোমাকেই আগে পাঠাতে চাই।'

রাজিয়া খাতুন তাকে পরামর্শ দিলেন, 'যদি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে আপনি আপোষই করতে চান তবে তার বিরুদ্ধে আর কোন তৎপরতা না চালানোই ভাল। সুলতানের গোয়েন্দাদের চোখ কান সব সময় খোলা থাকে। এসব তৎপরতা তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকবে না। কেন অনর্থক তাদের কুনজরে পড়তে যাবেন?'

তিনি ইয়াজউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' যদিও রাজিয়া খাতুন সবই জানতেন। একটু আগে দাসী তাকে সবই জানিয়ে গেছে।

তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কারণ তিনি কোথায় যাচ্ছেন এ কথা রাজিয়া খাতুনকে তিনি জানাতে চাচ্ছেন না। এ ব্যাপারটা তিনি গোপনই রাখতে চান। তিনি তো আর জানেন না যে, সুলতান আইয়ুবীর এক মহিলা গোয়েন্দার সাথে কথা বলছেন তিনি!

'ও কথা তুমি এখন জানতে চেয়ো না। আমি তোমাকে যে অনুরোধ করলাম তার কি করবে বলো?'

রাজিয়া খাতুন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনি যখনই বলবেন তখনই মীমাংসার জন্য আমি সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাবো। আমার বিশ্বাস, তিনি আমার আবেদন অগ্রাহ্য করবেন না।'

ইয়াজউদ্দিন মাথা নত করে রাজিয়া খাতুনের কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাজিয়া খাতুনের নিজস্ব দাসী ভেতরে প্রবেশ করে বললো, 'মোহতারাম আমীরকে খুব অস্থির ও বিষন্ন মনে হলো। ব্যাপার কি আপনি কিছু জানেন?'

এই দাসীও রাজিয়া খাতুনের বিশ্বস্ত অনুচর ছিল। তাই সে এ ধরনের প্রশ্ন করার সাহস পেলো।

'ঈমান ও সৎকর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মানুষের এ অবস্থাই হয়।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'শাসক শ্রেণী যখন জাতি থেকে পৃথক হয়ে বাদশাহ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায় তখন তারা গাছের ছিন্ন শাখার মতই মূলের সাথে সংযোগ হারায়। তাদের ভাগ্যে তখন এমন বিপর্যয়ই দেখা দেয়।'

রাজিয়া খাতুন আরো বললেন, 'খৃস্টানরা আমার স্বামীকে তাদের গোলাম বানানোর জন্য মদ ও নারীর প্রতি লোভাতুর করে তুলেছিল। তার ধমনীতে এই মিষ্টি বিষ ঢুকিয়ে তারা তাকে অকেজো করে দিয়েছে।

নইলে তিনি ছিলেন যুদ্ধের মাঠের রাজা। তার তলোয়ার খৃস্টানদের কচু কাটার মতই টুকরো টুকরো করে ফেলতো। কিন্তু তার সেই সাহস আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। সে আজ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আমার মত এক নারীর কাছে সাহায্য চাচ্ছে।

ক্ষমতার নেশা এভাবেই মানুষকে পাল্টে দেয়। বাঘ হয়ে যায় ভেড়া। পরাজয়ই হয় তার ললাট লিখন। যখন কোন বাহিনীর সেনাপতি ক্ষমতার জন্য লোভাতুর হয়ে পড়ে তখন তার

বাহিনীও দ্বীন ও ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যায়। আর সেই সুযোগে তাদের কাঁধে চেপে বসে শত্রুপক্ষ।'

সেই যুবতী পরিচারিকা রাজিয়া খাতুনের কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে ফাহাদ যেখানে থাকে সে দিকে হাঁটা ধরলো। সে ফাহাদকে বলতে চাচ্ছিল, 'ইয়াজউদ্দিন আরমেনিয়ার শাহের সাথে সাক্ষাত করার জন্য অচিরেই হারজাম রওনা হচ্ছে। এ খবর জলদি সুলতান আইয়ুবীকে পৌঁছে দিন।'

কিন্তু ফাহাদ যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলো তার কামরায় তালা মারা। ফাহাদ সেখানে নেই।

ফাহাদ প্রকাশ্যে ছিল এক উটের রাখাল। সে তার উটে করে ব্যবসায়ীদের মালামাল বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিত।

তার উটগুলো যেখানে থাকে সেখানে ছুটে গেল পরিচারিকা। কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। সেখানে অন্য রাখালরা তাদের উট নিয়ে খদ্দেরের আশায় বসেছিল। তাদের একজনকে পরিচারিকা কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ফাহাদ কোথায়?'

সে জানালো, 'ফাহাদ এক মুসাফিরের মাল নিয়ে অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে গেছে।'

জায়গাটির নাম শুনেই চিনলো পরিচারিকা। মুশেল শহরের ভেতরেই জনাকীর্ণ এক বাজারের ঠিকানা এটা। বাজারের পাশে বিশাল মাঠ। ওই মাঠে ব্যবসায়ীদের মালামাল নিয়ে যায় উট

চালকরা। সেখান থেকে দোকানের কর্মচারীরা এসে নিয়ে যায় তাদের মালামাল। কখনো উট চালকরাও দোকানে মাল পৌঁছে দেয়।

পরিচারিকার বিশ্রামের কোন অবকাশ ছিল না। দায়িত্ব তাড়া করে ফিরছিল তাকে। সে ওই বাজারের দিকে হাঁটা দিল এবং এক সময় সেই মাঠে গিয়ে হাজির হলো।

সেখানে পৌঁছেই সে ফাহাদের উটটিকে দেখতে পেলো। উটের পিঠে তখনো বেশ কিছু মাল। সে ওখানে ফাহাদকে দেখতে পেলো না বরং দেখলো এক লোক উটের পাশে বসে আছে। সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ফাহাদ কোথায়?'

লোকটি বললো, 'সে দোকানে মাল পৌঁছে দিতে গেছে।'

পরিচারিকা সেখানে অপেক্ষা করা ঠিক মনে করলো না, সে উটের কাছ থেকে সরে এলো। তার চোখ তখন চারদিকে ঘুরে ফিরছে। সেই চোখ বেকারার হয়ে খুঁজছে ফাহাদকে।

পরিচারিকা সেখান থেকে সরে গেলেও উটের দিকে একটি চোখ তার সার্বক্ষণিক লেপ্টে ছিল। একটু পর সে দেখতে পেলো ফাহাদ ফিরে এসেছে তার উটের কাছে।

সে বাকী মাল উট থেকে নামাতে লাগলো। লোকটি তখনও উটের পাশে বসা। পরিচারিকা সাবধানতার কারণে ওই লোকের সামনে আর যেতে সাহস পেলো না। সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

তার ইচ্ছা, মাল পৌঁছে দেয়ার পর ফাহাদ যখন তার উট নিয়ে লোকটির কাছ থেকে সরে পড়বে তখন সে তার সাথে দেখা

করবে।

উটের কাছে বসা লোকটি খেয়াল করলো, মেয়েটি ফাহাদকে খুঁজে না পেয়ে সরে গেলেও মাঠ থেকে বিদায় নেয়নি। সে এমনভাবে ঘোরাফেরা করছে যাতে সহজেই বুঝা যাচ্ছে, সে কাউকে খুঁজছে। কাকে খুঁজছে মেয়েটি? এই মেয়েকে আমি এর আগে কোথায় দেখেছি!

মেয়েটিকে ওই লোকের খুবই পরিচিত মনে হলো। হঠাৎ তার মনে খচ করে একটি প্রশ্ন বিদ্ধ হলো, 'মেয়েটি কোন গোয়েন্দা নয় তো?' যদি তাই হয় তাহলে এ মেয়েটিকে অনুসরণ করলে তো একাধিক গোয়েন্দাকে পাকড়াও করার একটা মওকা পাওয়া যেতে পারে।

লোকটি পরিচারিকার ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তখনই তার মনে পড়ে গেল, এ মেয়েকে সে মহলে দেখেছিল। লোকটি ইয়াজউদ্দিনের মহলে সম্প্রতি কাজ নিয়েছে। কিন্তু সে ইয়াজউদ্দিনের লোক ছিল না, সে ছিল খৃস্টানদের গুপ্তচর।

সে মুশেলের মুসলিম পরিবারের সন্তান হলেও খৃস্টানদের সাথে তার ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল। খৃস্টানরা তাকে দুটো দায়িত্ব দিয়েছিল। তার প্রথম কাজ ছিল ইয়াজউদ্দিনের দিকে নজর রাখা, যেন তিনি কখনো সুলতান আইয়ুবীর দিকে ঝুঁকে না যান। ফলে কারা ইয়াজউদ্দিনের কাছে আসা-যাওয়া করে এটা জানা যেমন তার জন্য জরুরী ছিল তেমনি তিনি কখন কাদের সাথে কি আলোচনা করেন তা জানাও তার দায়িত্ব ছিল।

তার দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল মহলে যারা কাজ করে তাদের দিকে

নজর রাখা। বিশেষ করে তাদের কেউ সুলতান আইয়ুবীর অনুচর কিনা তা খতিয়ে দেখা। তার মনে পড়লো, ভোরে এ মেয়েকেই সে ডাক্তারের কাছে দেখেছে। মেয়েটি তখন ব্যথায় কাৎরাচ্ছিল। পরে তাকে ডাক্তারের কাছ থেকে অষুধ নিয়ে চলে যেতেও দেখেছে।

কিন্তু এই মেয়ে রাজিয়া খাতুনের সাথে দেখা করে এখন বিশেষ দায়িত্ব পালন করছে এ কথা তার জানা ছিল না। মেয়েটির এখনকার চলাফেরায় অসুস্থতার কোন ছিটেফোটাও নেই। এত অল্প সময়ে মেয়েটি সুস্থ হয়ে এখানে আসার কথা নয়। নিশ্চয়ই অসুস্থতা ছিল তার ভান, কোন বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য মহল থেকে বেরোনো দরকার ছিল বলেই তাকে এ অভিনয়টুকু করতে হয়েছে। ফলে এখন আর সন্দেহ নয়, সে নিশ্চিত মনে ধরে নিল, এ মেয়ে গোয়েন্দা।

মেয়েটির চোখ তখনো ফাহাদের চলে যাওয়া রাস্তার দিকে। একটু পর সে দেখতে পেলো ফাহাদ তার উটের দিকে ফিরে আসছে। সে আরো লক্ষ্য করলো, উটের পাশে বসা লোকটি তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা দেখে সে আরো সাবধান হয়ে গেল।

সে ফাহাদের পথের পাশে চলে এলো এবং ফাহাদের পাশ ঘেঁষে ফাহাদের দিকে তাকিয়ে আলতো করে চোখ টিপে তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল। এতেই যা বুঝার বুঝে নিল ফহাদ।

গোয়েন্দা তাদের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু সেদিকে তাকালো না

পরিচারিকা। ফাহাদ তাড়াতাড়ি তার উটের কাছে গেল এবং উটের লাগাম ধরে মেয়েটি যে পথে এগিয়ে গেছে সেদিকে চলতে লাগলো।

অনেক লোকজনই সে পথে যাতায়াত করছিল। ফাহাদ মেয়েটির কাছে গেল। কিন্তু মেয়েটি থামলো না বা তাকে কিছু বললো না। সে আগের মতই নির্বিকারভাবে হাঁটতে লাগলো, যেন অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

ফাহাদও মেয়েটির দিকে মনযোগ না দিয়ে একই পথে হেঁটে চললো। মেয়েটি তার দিকে না তাকিয়েই তাকে উদ্দেশ্য করে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, 'মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। কিন্তু সাবধান, আমার দিকে তাকাবে না।'

ফাহাদ কান খাঁড়া করলো। পরিচারিকা অনুচ্চ কণ্ঠেই তার কথা শেষ করলো। কিছু দূর তারা পাশাপাশি হেঁটে গেল। মেয়েটি ফাহাদকে শুনিয়ে বললো, 'যা বললাম তা সমাধা করে সেখানে চলে আসবে যেখানে আমরা সুযোগ পেলেই একসাথে একান্তে বসে কথা বলি। তবে এখনি নয়, কেননা এখন আমি জরুরী দায়িত্ব পালন করছি। এমন কিছু করা আমাদের উচিত নয় যাতে আমি আমার দায়িত্ব থেকে গাফিল হয়ে যাই।'

মেয়েটি তার দিকে না তাকিয়েই বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো সুলতানের সেনাবাহিনী এখন কোথায়?'

'হ্যাঁ, জানি।' ফাহাদ উত্তর দিল, 'আমি এখনিই যাত্রা করবো।'

'আল্লাহ হাফেজ।' মেয়েটি বললো।

'ফি আমানিল্লাহ!'

মেয়েটি একদিকে ঘুরলো। সেদিকে একটা গলি ছিল। সে ঘুরতে গিয়ে দেখতে পেলো লোকটি তখনো তার পিছনে আসছে। তখনি তার মনে হলো, এ লোককে সে আগেও কোথাও দেখেছে। কোথায় দেখেছে সে কথা ভালমত স্মরণ করতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেলো, এ লোককে সে মহলেই দেখেছে। লোকটি মহলেই চাকরী করে।

হঠাৎ করেই তার মনে ভীষণ ভয় ঢুকে গেলো। এ লোক কি তবে আমাকে অনুসরণ করছে? আমাকে কি সে সন্দেহ করেছে? আমি যে এক গোয়েন্দা সে পরিচয় কি তবে ফাঁস হয়ে গেল? প্রশ্নগুলো এক সাথে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার চেতনায়।

সে লোকটির উদ্দেশ্য পরখ করার জন্য এক গলি থেকে আরেক গলিতে ঢুকে গেল। এভাবে সে দু'তিনটি গলিতে মোড় ঘুরেও দেখতে পেলো লোকটি তার পিছু ছাড়েনি। আগের মতই লোকটি তার পিছনে লেগে আছে।

মেয়েটি লোকালয়ের বাইরে এক পার্কে চলে গেল। সে লোকও তার পিছনে পিছনে লোকালয় থেকে বাইরে চলে এলো।

মেয়েটি কিছু দূরে এক গাছের ছায়া ও ঝোপের পাশে বসে পড়লো। লোকটি এবার তাকে রেখে সামনে চলে যেতে বাধ্য হলো। মনে হয় লোকটি ভেবেছে, মেয়েটি কারো অপেক্ষায় সেখানে বসে আছে। মেয়েটি সেই লোকের চলে যাওয়া দেখলো বসে বসে। সে বহু দূরে চোখের আড়ালে চলে গেলে

মেয়েটি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো।
মেয়েটি ছিল যথেষ্ট সতর্ক ও সাবধান। সে শীঘ্রই ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে গেল এবং ঝোঁপের ভেতর দিয়ে বসে চুপি চুপি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে একটি গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।
সে লোকও কিছু দূর গিয়েই এক গলিতে ঢুকে গেল এবং একটু পর অন্য রাস্তা ধরে ফিরে এলো সেখানে। লোকটির আশা ছিল, সে মেয়েটির পাশে কোন লোককে বসে থাকতে দেখবে। কিন্তু সে ঝোঁপের কাছে এসে দেখলো মেয়েটি সেখানে নেই। সে এদিক ওদিক তাকালো, কিন্তু মেয়েটির কোন চিহ্নই খুঁজে পেলো না আশেপাশে।
ততোক্ষণে মেয়েটি তার বাড়ীর কাছে পৌছে গেছে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আরমেনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী যে কোন সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু তিনি একা। শুধু একমাত্র আল্লাহ তাঁর সহায়।
মুসলমান আমীররা গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। তারা নিজ নিজ রাজ্য ও গদি রক্ষার আশায় তাদের ঈমান খৃস্টানদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এর আগে গৃহযুদ্ধেও এরা লিপ্ত হয়েছিল খৃস্টানদের উস্কানি ও সহযোগিতায়।
এখন সুলতান আইয়ুবী শক্তি প্রয়োগে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যেসব রাজ্য

বাগদাদের খেলাফতের বশ্যতা স্বীকার করবে না এবং ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে আমি যে অভিযান চালাচ্ছি তাতে শরীক হবে না তাদের আমি স্বাধীনও থাকতে দেবো না।'

এই ঘোষণা কার্যকরী করার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই কয়েকটি কেল্লা অধিকার করে তার নিয়ন্ত্রণ ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। সে সব কেল্লার অধিপতি ও আমীররা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এখন তিনি সেই শাসক ও আমীরদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন যারা কিছুটা শক্তিধর। সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের দিকে তাঁর মূল দৃষ্টি অক্ষুন্ন রেখেই এই অভিযানে বেরিয়েছেন। এতে তাঁর বীরত্ব ও কৌশল প্রকাশ পেলেও এই দ্বিমুখী শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানো যে কত বড় ঝুঁকি প্রতিটি পদে পদে তিনি তা টের পাচ্ছিলেন!

'যদি তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সৎ হয় তবে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' সুলতান আইয়ুবী আল খালিদের দিকে অভিযানের সময় এক স্থানে ক্যাম্প করে সেখানে তার সেনাপতি ও কমান্ডারদের বললেন, 'আমি জানি তোমরা কি চিন্তা করছো? যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার এই সিদ্ধান্তে একমত হতে না পারো, যদি ভাবো খৃস্টানদের তরফ থেকে ঝুঁকি থাকার পরও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ভুল করেছি, তাদের আমি বলবো, আমি সঠিক পথেই আছি এবং সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

আমি তাদের এ কথা বলবো না, তোমরা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এ আদেশ মেনে নাও এবং তোমরা যাকে ভুল সিদ্ধান্ত মনে করছো তা সফল করার জন্য শর্তহীনভাবে কাজ করো। আমি তাদের বলবো, তোমরা আগে আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে চেষ্টা করো। অন্তর থেকে সমস্ত ভয় ভ্রান্তি দূর করে এসো আমরা আমাদের মঞ্জিল ও লক্ষ্য বানিয়ে নেই জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস।

আমাদের প্রথম কেবলা পূনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ আমাদের এক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন। আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দার হয়ে গেছে বলেই আজ আমাদের ঘরে-বাইরে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে আমরা খৃস্টানদের দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম। তাতে বাস্তব অবস্থা এই হতো, যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই তার দখল থাকতো আমাদের দুশমন খৃস্টানদের হাতে আর আমরা যে ঘরে ছিলাম তার মালিকানা হস্তগত করে বসে থাকতো খৃস্টানদেরই দোসর একদল গাদ্দার। আমরা হয়ে পড়তাম ঠিকানা বিহীন। মরুভূমি আর পাহাড় পর্বতই হতো আমাদের ঠিকানা।

তাই দুশমনের দিকে হাত বাড়াবার আগে আমি নিজের ঘরকে হেফাজত করতে চাই। যাদের বায়তুল মুকাদ্দাস প্রয়োজন নেই, যাদের প্রয়োজন শুধু গদি ও বাদশাহী তাদের হাত থেকে আমি রক্ষা করতে চাই এ জাতিকে। এ চাওয়া কোন অপরাধ হতে পারে না।

স্মরণ রেখো বন্ধুগণ! যদি আমরা এ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হই তবে যখন ইতিহাস লেখা হবে তখন তাতে লেখা হবে 'অমুক' যুগের সৈন্যবাহিনী অযোগ্য ও কাপুরুষ ছিল। পরাজয়ের গ্লানি সর্বদা সৈন্যদের নামেই লেখা হয়। তাই এই অপবাদ তোমাদের ঘাড়েই বর্তাবে।

শাসক শ্রেণী যদি কাফেরদের সাথে গোপন বা প্রকাশ্য বন্ধুত্ব গড়ে তোলে এবং তাদের সাথে জোটবদ্ধ থাকে, তবু ভবিষ্যত প্রজন্ম সেনাবহিনীকেই অভিশাপ দেবে। তারা বলবে, জাতির রক্ষক সেনাবাহিনী সেদিন কি চোখে ঠুলি পরে বসেছিল?'

তিনি উপস্থিত সেনা কমান্ডারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং একদিন তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমাদেরকে সে দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন কোরবান করতে হবে।

ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের প্রতি আমার কোন দয়ামায়া নেই, থাকতে পারে না। যদি আমরা এখন পৃথক পৃথক রাজ্য গঠনকে অনুমোদন করি এবং এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাই, যদি শত্রুদের বন্ধুত্ব ও মিলনকে প্রতিরোধ না করি তবে একদিন এই মিলন ইসলামের ধ্বংস ও বিনাশের মূল কারণ হয়ে দেখা দেবে।

বন্ধুরা! তারপর আসবে সেই সময়, যখন পৃথিবীতে নামে মাত্র ইসলামী রাজ্য থাকবে, কিন্তু তার শাসন চলবে ব্যক্তির খেয়াল

খুশী মতো। আল্লাহর কালাম নয় রাষ্ট্র চলবে শাসকের ইচ্ছামাফিক। আর এই শাসকরা আমোদ ফুর্তিতে মত্ত থাকবে। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বন্ধু বানাবে শক্তিধর শত্রুকে। নিজের রাজ্যের সীমানা ঠিক রাখার জন্য তাদের ঈমানকে তারা নিলামে তুলে দেবে।
শত্রুদের শক্তিধর রাজ্যের সরকারকে খুশী ও সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুসলিম রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। কাফের ও খৃস্টানদের সাথে শত্রুতা নিঃশেষ হলেও নিজেদের মধ্যে শত্রুতা অব্যাহত থাকবে যুগের পর যুগ। এ শত্রুতা কখনো নিঃশেষ হবে না। এভাবেই আমরা একে অপরকে দেউলিয়া বানিয়ে এবং নিজেরা দেউলিয়া হয়ে মনের আশা পূরণ করবো ইহুদী ও নাসারাদের।
তখন চামচিকা লাথি মারবে হাতির গায়ে আর সিংহ ইঁদুরের ভয়ে গর্তে লুঁকাবে। মুসলিম সরকার ও শাসক প্রজাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। রাজনীতিবিদ ও শাসকরা সম্মানহীন ও ঘৃণার পাত্রে গণ্য হবে।
তাই এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোকে আজই এক পতাকার তলে শামিল করতে হবে আমাদের। এতে যে পরিমাণ ত্যাগ ও কোরবাণী দরকার হাসি মুখেই তা বরদাশত করার জন্য তোমরা কি প্রস্তুত আছো?'
কমান্ডাররা আবেগের সাথে সম্মিলিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আমরা প্রস্তুত সুলতান!'
'আমি এ কথা তোমাদের এ জন্যই বার বার বলছি, যাতে

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমাদের কারো মনেই কোন অস্পষ্টতা না থাকে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'নিজের সংকল্পের কথা বার বার স্মরণ করতে হয়। তাতে কথাগুলো অন্তরে গেঁথে থাকে এবং এই স্মরণই তাকে বাঁচিয়ে রাখে যুগের পর যুগ।'

সুলতান বললেন, 'এমন যেন না হয়, ইসলামী জাগরণের বিপক্ষে যার অবস্থান এবং যে আমাদের দুশমনের মিত্র তার সামনে তোমার তলোয়ার ঝুঁকে যায়। মনে রেখো, জাতির ঐক্য বিনষ্টকারী ভাই শত্রুর চেয়েও ভয়ংকর ও ক্ষতিকর।

তোমরা জানো, আমি আল খালিদ অবরোধ করতে যাচ্ছি। সামনেই আল খালিদ। তাই এখানেই আমাদের শেষ বিরতি ও শেষ ক্যাম্প। অবরোধের ব্যাপারে তোমাদের কার বাহিনী কোথায় থাকবে আগেই বলেছি।

রিজার্ভ বাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কমান্ডো বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখবে। আমি আশংকা করছি, খৃষ্টান বাহিনী আরমেনিয়ার সৈন্যদের অবরোধ মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। কমান্ডো বাহিনী খৃস্টান সৈন্যদের আসার পথ বন্ধ করে রাখবে।

গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে খৃষ্টানদের আক্রমণের ভয় না থাকলেও এই সতর্কতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে।'

তিনি আরো বললেন, 'আমরা আর্মেনিয়ানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাই না। আমি শুধু আরমেনিয়ায় শাহের নিকট থেকে কিছু শর্ত আদায় করতে চাই। আমি খবর পেয়েছি,

ইয়াজউদ্দিন শাহ আরমানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা যদি আরমেনিয়ানদের ওপর চেপে বসতে পারি তবে শাহ আরমান ইয়াজউদ্দিনকে সাহায্য করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, আরমেনিয়ার সৈন্যবাহিনী ও দেশের নাগরিকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে আমাদের মোকাবেলা করে এবং কোন কারণে আমাদের পিছু হটতে হয় তখন ইয়াজউদ্দিনও আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। শুধু তাই নয়, আমরা পিছু হটছি দেখলে হলবের আমীর ইমাদউদ্দিন তার পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট আমীর ও কেল্লাদারদের সংগঠিত করে আমাদেরকে তাদের পদতলে পিষে মারার জন্য ছুটে আসবে।'

তিনি বললেন, 'এই ভয় ও পরিণতির কথা মনে রেখে আমাদের প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হবে। আমি তোমাদের যুদ্ধের নকশা দেখিয়ে দিয়েছি। যদি কারও কোন সন্দেহ থাকে তবে সমাধান করে নাও। মনে রেখো, এই অবরোধ ও যুদ্ধ আমাদেরকে কঠিন বিপদে ফেলতে পারে, আবার এই যুদ্ধ আমাদের অগ্রযাত্রার পথও খুলে দিতে পারে।'

তিনি এই ভাষণ দিচ্ছিলেন রাতের প্রথম প্রহরে। তিনি যখন তাঁর সেনাপতি ও কমান্ডারদেরকে যুদ্ধের নির্দেশনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তার সামনে পড়েছিল যুদ্ধের নকশা।

এক প্রহরী তাবুর মধ্যে ঢুকে তার কানে কানে কিছু বললো।

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'জলদি তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

প্রহরী তাবুর পর্দা উঠিয়ে মাথা বের করে ইশারা করলো, ক্লান্ত

ফাহাদ ঢুকলো তাবুর মধ্যে। সে মুশেল থেকে এ পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে পথ চলেছে।

সীমাহীন পরিশ্রমে তার চেহারা ভেঙ্গে পড়েছিল। তার ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল, চোখ ঢুকে পড়েছিল গর্তের ভেতর।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ তাবুতে বসেছিলেন। ফাহাদকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে তুমি বিশ্রাম ছাড়াই সফর করেছো?'

সুলতান আইয়ুবী ফাহাদকে বললেন, 'একটু বসো, বিশ্রাম করো।' তারপর তিনি প্রহরীর দিকে তাকিয়ে প্রহরীকে বললেন, 'এর জন্য এখানেই খানা নিয়ে এসো।'

প্রহরী বেরিয়ে গেল। তিনি আবার ফাহাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আগে কিছু খেয়ে নাও, এরপর তোমার সাথে কথা বলবো।'

'সংবাদ এমন জরুরী ছিল যে, বিশ্রামের কোন সুযোগ ছিল না।' ফাহাদ তখনো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল, 'আমার ঘোড়াটিকে বোধ হয় বাঁচাতে পারবো না। আমি খাওয়ার আগেই আপনাকে সেই জরুরী সংবাদ শোনাতে চাই।'

'ঠিক আছে, কি এমন জরুরী সংবাদ বলো?'

'শাহ আরমান এখন তার রাজধানীতে নেই।' ফাহাদ বললো, 'তিনি এখন হারজাম নামক স্থানে তাবু করে আছেন। ইয়াজউদ্দিন তার সাথে সাক্ষাত করতে সেখানে যাচ্ছেন। জানা গেছে, সেখানে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

কিভাবে আপনার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা যায় তার উপায় নির্ধারণের শলাপরামর্শ করার জন্য শাহ্ আরমান ইয়াজউদ্দিনকে হারজামে দাওয়াত করেছেন। শাহ্ আরমানর সাথে হারজামে দুই ডিভিশন সৈন্য আছে, আর ইয়াজউদ্দিনের সাথে থাকবে তিন ডিভিশন সৈন্য।'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা দুই গাদ্দারের মধুর মিলন।' সুলতান আইয়ুবী হেসে বললেন, 'এখন বলো মুশেলে খৃস্টানদের তৎপরতা কেমন চলছে?'

'খৃষ্টানরা এখন অনেক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।' ফাহাদ উত্তর দিল, 'তারা পাহাড়ের গুহায় যুদ্ধের যে সাজ সরঞ্জাম জমা করেছিল তা ধ্বংস করা হয়েছে এ সংবাদ আপনি আগেই পেয়েছেন। সেখানকার অধিবাসীদের মনে ভূয়া দরবেশ যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল আমরা তার অনেকটাই দূর করে দিয়েছি।'

'শাহ্ আরমান ও ইয়াজউদ্দিন হারজামে বৈঠকে বসছে এ খবর তুমি কেমন করে কার কাছ থেকে জানলে?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তার মানে আমি জানতে চাচ্ছি, এ সংবাদের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু?'

'মোহতারেমা রাজিয়া খাতুনের সংবাদ কখনও মিথ্যা হতে পারে না।' ফাহাদ বললো, 'এ খবর আপনার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আল্লাহ এই মহিয়সী মহিলাকে তার আপন করুণা ধারায় সিক্ত করে রাখুন।' সুলতান আইয়ুবীর কণ্ঠ আবেগে ভারী হয়ে উঠলো।

'আর রাজিয়া খাতুন আপনাকে সালাম জানিয়ে বলতে বলেছেন, ফাহাদ বললো, 'ইয়াজউদ্দিনের পা যুদ্ধের আগেই ভেঙ্গে গেছে। তাঁর উপর এখন ভয় ও আতংক চেপে বসে আছে। যদিও তিনি এক পায়ে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তার অবস্থা বড়ই নাজুক। এখন সামান্য আঘাতেই তিনি হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাবেন।'

'মুশেলে কোন সামরিক তৎপরতা আছে?' সুলতান আইয়ুবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি?'

'খৃষ্টান গোয়েন্দা ও উপদেষ্টাদের তৎপরতা আছে।' ফাহাদ উত্তর দিল, 'কোন যুদ্ধের আলামত চোখে পড়লো না। ইয়াজউদ্দিন খৃস্টানদের কাছ থেকে কি ধরনের সাহায্য চাচ্ছে তা তো আপনি ভাল করেই জানেন।

খৃস্টানদের মজুত অস্ত্রভান্ডার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার সে আশার গুড়ে বালি পড়েছে। শহরে আমাদের কমান্ডোরা সফলতার সাথেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজিয়া খাতুন ও তার মেয়ে শামসুন নেছার মাধ্যমে কেল্লা ও মহলের ভেতরের সব সংবাদ এবং গোপন তথ্যও আমরা ঠিক মতই পাচ্ছি।'

সুলতান আইয়ুবী ফাহাদের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস নওজোয়ান! তুমি যে সংবাদ এনেছো তা যে কত মূল্যবান তা আমি তোমাকে বুঝাতে পারবো না।'

তিনি সৈনিকদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমাদের এ বন্ধু যে খবর নিয়ে এসেছে তাতে যুদ্ধের ছক আমাদের পাল্টাতে হবে। আরেকটু বিলম্বে এলে এ খবর পাওয়ার আগেই হয়তো আমরা

আল খালিদ অবরোধ করে বসতাম। কিন্তু এখন যুদ্ধের এমন এক পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে যাতে খুন খারাবীর সম্ভাবনা খুবই কম।'

তিনি সেনাপতিদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাদের সৈন্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আল খালিদের দিকেই এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমি তাদের সাথে আল খালিদ অবরোধ করতে যাবো না। আমি একটি শক্তিশালী কমান্ডো বাহিনী নিয়ে গোপনে হারজামের পথ ধরবো। আমাদের বন্ধুরা টের পাওয়ার আগেই আমি তাদের ওপর চড়াও হতে চাই।'

হারজাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত একটি জায়গা। চারদিকে সবুজের সমারোহ। বালিয়াড়ির পরিবর্তে মাঠ জুড়ে আদিগন্ত সবুজ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিছু পাহাড় আছে, পাহাড়গুলোও সবুজে ঢাকা।

পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সুপেয় পানির ঝরনা। পাহাড়ের পাদদেশে বৃক্ষরাজিতে ভরা প্রান্তর। সবুজে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলের পাশেই মনোরম ও অভিজাত জনবসতি।

আল্লাহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছিলেন হারজাম অঞ্চলটি। আরমেনিয়ার শাহ একে আরও সুশোভিত করে গড়ে তুলেছিলেন। পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে তুলেছিলেন সুরম্য ও নিরাপদ বাগানবাড়ি।

মহলের সামনে খোলা চত্বরে সামিয়ানা টানিয়ে ইয়াজউদ্দিনকে অভ্যর্থনার আয়োজন করছেন শাহ আরমান। সামিয়ানার ওপর

দেয়া হয়েছে মোটা ত্রিপলের কাপড়, যাতে রোদ ও বৃষ্টিতে সবাই নিরাপদ থাকতে পারে। সেখানে রঙিন ঝাড়বাতি দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহলের সামনে ছয়টি ঘোড়ার গাড়ীতে সুসজ্জিত রাজকীয় রক্ষী বাহিনী অবস্থান নিয়েছে ইয়াজউদ্দিনকে গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য। তাদের পেছনে পদাতিক ও অশ্বারোহী দল। চারদিকে সাজ সাজ রব। সত্যি এক বর্ণাঢ্য আয়োজন।

মহলের ভেতরের অবস্থা আরো মনোরম। নাচ গান ও বাজনার জন্য নামী দামী শিল্পীদের এনে জড়ো করা হয়েছে মহলে। আরমেনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও নর্তকীদের পদচারণায় মুখর মহলের জলসাঘর। হেরেমের বাছাই করা সুন্দরী দাসীদের রাখা হয়েছে পৃথক কামরায়।

আরমেনিয়ার শাহ ইয়াজউদ্দিনকে ছাড়াও এখানে দাওয়াত দিয়েছে মারবীনের আমীরকে। মারবীন হারজামের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। এর আমীর কুতুবুদ্দিন গাজী। মেহমানদের জন্য টানানো সুন্দর সামিয়ানা থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের সবুজ ঢালে অবস্থান নিয়েছে শাহ আরমানের দুই ডিভিশন সৈন্য।

ইয়াজউদ্দিন তখনো এসে পৌঁছেননি। শাহ আরমান মারবীনের আমীর কুতুবুদ্দিন গাজীর সাথে দু'তিন দিন শিকার করে কাটালেন। একদিন তিনি খবর পেলেন মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিন হারজামের সীমানায় প্রবেশ করেছেন।

মহলের বাইরে গিয়ে আরমেনিয়ার শাহ এবং মারবীনের আমীর

কুতুবুদ্দিন গাজী ইয়াজউদ্দিনকে অভ্যর্থনা জানালেন। আরমেনিয়ার সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। তিনি নিজের সঙ্গে আনা তিন ডিভিশন সৈন্য বাইরে রেখে মহলে প্রবেশ করলেন।

রাতে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সম্মানে জমজমাট নাচ ও গানের জলসার আয়োজন করা হলো। দেশের শ্রেষ্ঠ সরোদবাদক ওস্তাদ জামশেদের আগের দিন আর নেই। বয়সের ভারে কাবু হয়ে গেছেন। তবু তিনি এলেন এবং অতিথিদের মোহিত করলেন নিজের সরোদ বাজিয়ে।

রাত বাড়তে লাগলো। একে একে শূন্য হতে লাগলো মদের পাত্রগুলো। উর্বশী মেয়েরা বাজনার তালে তালে নেচে চললো। যুবতী মেয়েরা মেহমানদের হাতে তুলে দিতে লাগলো মদের পেয়ালা।

ইসলাম মদকে হারাম করেছে, পরনারীর সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কোন অবকাশ নেই ইসলামে। কিন্তু এখানে সবই চলছিল। অথচ এরা শুধু মুসলমানই নয়, মুসলিম সমাজের নেতা।

নারী ও মদ তাদেরকে ভিন্ন এক দুনিয়ায় নিয়ে গেল। নিজের ঈমান ও আকীদার কথা ভুলে গেল ওরা। ভুলে গেল ওরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নবীর উম্মত, শ্রেষ্ঠতম জাতি। ভুলে গেল তারা দুনিয়ায় এসেছে কেবল ভোগের জন্য নয়, এসেছে দুনিয়াকে আবাদ করতে, দুনিয়াকে মানুষের বাসযোগ্য করতে। এভাবেই তারা তাদের শরীর থেকে মুসলমানিত্বের নাম নিশানা

তুলে দিচ্ছিল।

রাতটি তাদের খুব আনন্দ ফুর্তিতেই কেটে গেল। পরের দিন বলতে গেলে তারা সারাদিনই ঘুমিয়ে কাটালো।

যে রাতে তারা মদ ও নারী নিয়ে রঙিন ঝাড়বাতির নিচে মাতাল অবস্থায় মত্ত ছিল, সে রাতে সুলতান আইয়ুবী সেখান থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে এক পাহাড়ের আড়ালে তাঁর কমান্ডো বাহিনী নিয়ে পাথরযুক্ত মাটিতে শুয়ে ছিলেন।

তিনি ছোট ছাতার মত তাবু সাথে এনেছিলেন যেন সেগুলো অল্প সময়ে টানানো যায় ও উঠানো যায়। তিনি সেখানে সুলতান নয় কমান্ডো বাহিনীর এক কমান্ডার হয়ে এসেছিলেন।

পরদিন ভোরে যখন ক্লান্ত মেহমানরা ঘুমোতে গেল তখন তিনি তার গোয়েন্দাদের বললেন, 'ওদিকের খবর জানা দরকার, তারা এখন কি করছে?'

সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনীর কমান্ডার কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন সেই রাজকীয় প্রমোদ ভবনের খবর সংগ্রহ করতে। গোয়েন্দারা সঙ্গে সঙ্গে মরু যাযাবরের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লো। তাদের বলা হলো, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য নিয়ে তারপর ফিরে আসবে।'

এই গোয়েন্দা দলের মধ্যে ফাহাদও ছিল। সে ছিন্ন মলিন কাপড় পরে শাহ আরমানের সেনা ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেল। তার সঙ্গীরাও কেউ রাখালের বেশে, কেউ ব্যবসায়ীর বেশে পৌঁছে গেল সেখানে। স্থানীয় লোকদের সাথে মিশে অনায়াসে তারা সেখানে ঘুরাঘুরি করতে লাগলো। সৈন্যরা তাদেরকে সেখান

থেকে চলে যেতে বললে দুই গোয়েন্দা ভিক্ষুকের বেশে তাদের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে লাগলো।

ফাহাদ মহলের বাইরে আগন্তুক মেহমানদের সফরসঙ্গী ও রাজকর্মচারীদের থাকার জন্য যে সামিয়ানা ও তাবু টানানো হয়েছিল সেখানে গেল। সে ইয়াজউদ্দিনের সাথে আসা কর্মচারীদের মধ্যে তাদের কোন গোয়েন্দা আছে কিনা জানতে চাচ্ছিল।

এমন সময় সে দেখতে পেলো, রাজিয়া খাতুনের পাঠানো খবর সুলতানকে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে যে খাদেমা মুশেলে তার সাথে দেখা করেছিল সেই মেয়ে এক তাবু থেকে বেরিয়ে আরেক তাবুর দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারলো ফাহাদ। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে খুশির ঝর্ণা বয়ে গেল। এই মেয়ে ছিল ইয়াজউদ্দিনের খুবই বিশ্বস্ত ও পছন্দনীয় দাসী। তাই তিনি তাকে তার এ সফরেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

ফাহাদ ভিক্ষুকের মত শব্দ করে এর ওর কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলো। তার চোখ ছিল সেই মেয়েটির দিকে এবং এক সময় তার কাছে গিয়ে বললো, 'শাহজাদী! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। দয়া করে মুসাফিরকে কিছু খাবার দেবেন?'

'ভাগো এখান থেকে। আমরাই এখানে মেহমান, তোমাকে খাবার দেবো কোত্থেকে?'

'দয়া করুন শাহজাদী, আমি তো আপনার এক গোলাম। আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আপনার দয়ার শরীর,

আপনার কাছ থেকে আমি কি খালি হাতে ফিরতে পারি?'
'বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাকে সৈন্যদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবো। যাও এখান থেকে, নইলে সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দেবো।'
'ফাহাদকে মুশেলেও কেউ ধরতে পারেনি, তুমি এখানে তাকে ধরিয়ে দেবে?' ফাহাদ তার আসল কণ্ঠস্বরে কথা বললো এবার।
'ওহ!' মেয়েটি চমকে এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললো, 'তাহলে তুমি চলে এসেছো! দেখো, আমার সংবাদ তো মিথ্যে হয়নি? কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। জলদি সরে পড়ো এখান থেকে। রাতে তুমি কোথায় থাকবে? রাতে আমি তাড়াতাড়ি মাহফিল থেকে বিদায় নিয়ে তোমার কাছে চলে যাবো। তখন অনেক কথা বলতে পারবো তোমার সাথে। এখন যাও, নইলে বিপদে পড়ে যাবে!' মেয়েটি সতর্ক কণ্ঠে তাকে চলে যাওয়ার জন্য তাড়া দিল।
'তুমিই তো বলেছিলে দায়িত্বের উপর আবেগকে প্রশ্রয় দিও না।' ফাহাদ বললো, 'আমি এখন ডিউটিতে আছি। রাতে কখন কোথায় থাকবো আমি নিজেও জানি না। যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। সময় মতো আমিই তোমাকে খুঁজে নেবো।'
'ঠিক আছে, নতুন কোন খবর পেলে তোমার জন্য জমা করে রাখবো।' মেয়েটি প্রশ্ন করলো, 'সুলতান এখন কোথায়?'
'সুলতান সময় মত হাজির হয়ে যাবে। তুমি চোখ কান খোলা

রেখো।'

মেয়েটি আস্তে বললো, 'ঠিক আছে।' তারপর গলা চড়িয়ে বললো, 'এখানে কি তোমার জন্য লংকরখানা খোলা হয়েছে নাকি? যাও ভাগো এখান থেকে। যত্তোসব। বেড়াতে এসেও এই ভিক্ষুকদের যন্ত্রণায় একটু শান্তিতে থাকার উপায় নেই।'

মেয়েটি ফাহাদকে তিরস্কার করতে শুরু করলে ফাহাদ সেখানে আর না দাঁড়িয়ে একদিকে হাঁটা ধরলো। মেয়েটি গজর গজর করতে করতে ঢুকে গেল এক তাবুতে।

তাবুতে ঢুকে মেয়েটি পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলো ফাহাদের গমন পথের দিকে। তার চোখ দুটি পানিতে ভরে গেল। হায়, কি কঠিন দায়িত্ব ফাহাদের! কত কষ্টকর কাজ! পদে পদে বিপদ। ভয়ংকর মৃত্যুর হাতছানি চারদিকে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। বিরাট দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে মরছে।

মেয়েটি এই সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবককে মনে প্রাণে ভালবাসে। কিন্তু সে যখন লুকিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করে তখন সে তার আবেগকে কখনোই প্রকাশ করতে পারে না। সে তখন তার দায়িত্বের বিষয় নিয়েই তার সাথে কথা বলে।

সুলতানের সৈন্যরা যেসব যুদ্ধে সফলতা লাভ করে তার বিজয়ের মূলে আছে ফাহাদ ও এই মেয়েটির মত গোয়েন্দাদের সীমাহীন ত্যাগ। এরা শত্রুর দুর্গে বসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করে যায় অনবরত। এদের জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে। সব জেনে বুঝেও যারা এই কঠিন জীবন বেছে

নের প্রকৃত মুজাহিদ তো তারাই।
মেয়েটি মনে মনে বলছিল, 'যদি এ দায়িত্ব ঈমানী দায়িত্ব না হতো তবে আমি ফাহাদকে এভাবে ভবঘুরের মত বিপদ মাথায় নিয়ে ঘুরতে দিতাম না। হয়তো দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফাহাদের রাত কাটবে পাথরে মাথা রেখে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। যদি দুনিয়ায় তাকে না পাই আমি কাল হাশরের মাঠে আল্লাহকে বলবো, 'আল্লাহ আমি তাকে ভালবাসি। দুনিয়ায় তাকে আমি পাইনি খোদা, এখন তাকে আমি চাই।'
ফাহাদ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। মেয়েটি তাবুর পর্দা ছেড়ে ভেতরে মাথা নিল।

রাতের প্রথম প্রহর। আজ রাতে হারজামের শাহী ক্যাম্পে কোন গান বাজনার আয়োজন করা হয়নি। শাহ আরমান, ইয়াজউদ্দিন এবং মারবীনের আমীর কুতুবুদ্দিন গাজী মুখোমুখি বসেছিলেন। সবার চেহারায় চিন্তার রেখা। ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার রাজ্য সীমা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়েই চলেছে। দিন দিন তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ছে। এ অবস্থায় আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। তার সাথে আমাদের যে কোন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে। হয় তার বন্ধু হতে হবে, নয়তো শত্রু। এখন কোন পথ আমরা বেছে নেবো তাই আমাদের ঠিক করতে হবে।'
'যদি আমরা তাঁর সাথে যুক্ত হই তিনি আমাদেরকে তার

অধীনস্ত বানিয়ে নেবেন।' বললো শাহ আরমান, 'আমরা তখন আর স্বাধীন শাসক থাকতে পারবো না।'

'আমিও সে কথাই বলি।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'বর্তমানে তিনি মুসলমানদের কয়েকটি কেল্লা দখল করে সেখানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে সে সব কেল্লার অধিপতিরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। যদি আমরা তাকে বাঁধা না দেই তবে তিনি শুধু মুশেলের উপর নয় হলবের উপরও আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করবেন।'

'এ কথা আপনি বলবেন কেন, তিনি নিজেই তো সে ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন। আমার গোয়েন্দারা জানিয়েছে, তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিন অভিযানে যারা আমার সহযোগী হবে না তাদের আমি স্বাধীন থাকতে দেবো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও কেল্লা দখল করে তিনি তার ঘোষণার বাস্তবায়ন শুরু করেছেন।' চিন্তিত মুখে বললেন শাহ আরমান।

'সে ক্ষেত্রে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া কোন গতি নেই। কিন্তু আমি একা তার বিরুদ্ধে লড়ে সফল হতে পারবো না। আমাদের কারোরই এমন শক্তি নেই যে, একা একা তার মোকাবেলা করবো।

ইমাদুদ্দিন আমার সাথে আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তার বাহিনী হলব ত্যাগ করতে পারছে না। কারণ সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার সৈন্য বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছেন। যে কোন মুহূর্তে তিনি ইমাদুদ্দিনের বাহিনীর ওপর

চড়াও হয়ে যেতে পারেন। কারণ হলব তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ জন্যই হলবের বাহিনীর বাইরে বের হওয়া ঠিক হবে না। হলবের প্রতিরক্ষার দিকেই তাদের বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে।'

'তা আমি জানি।' শাহ আরমান বললেন, 'খৃস্টানদের দৃষ্টিও হলবেই পড়ে আছে। হলব সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আইয়ুবী বলুন আর খৃস্টান বলুন, সবারই দৃষ্টি এখন হলবের দিকে।'

'সে কারণেই আমি প্রকাশ্যে খৃষ্টানদের সাথে কোন চুক্তি বা জোট করতে ভয় পাই।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তারা যদি আমাকে সাহায্য করে তার বিনিময়ে তারা চাইবে, আমি যেন হলব অধিকারে তাদের সহযোগী হই।'

'হ্যাঁ, এটা তারা অবশ্যই চাইবে।' কুতুবুদ্দিন গাজী বললেন, 'আমি সবচে উত্তম মনে করি, আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করা। আমার বিশ্বাস, আপনাদের দু'জনের সৈন্য মিলিত হলে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি আপনাদের সাথে জুড়ে দিতে প্রস্তুত।'

'আমি জানতে পেরেছি, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনী আল খালিদের দিকে যাত্রা করেছে। ফলে আমাদের মধ্যে শাহ আরমানই এখন সবচে বিপদ ও ঝুঁকির মধ্যে আছেন।' ইয়াজউদ্দিন শাহ আরমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি জানেন এ খবর?'

বিচলিত শাহ্ আরমান বললেন, 'আমার তো তার সাথে কোন শত্রুতা নেই! তিনি কেন আমাকে আক্রমণ করতে যাবেন?'

শাহ্ আরমান আরো বললেন, 'আমার ধারণা তিনি আমার সীমানা থেকে দূরে থাকবেন। হয়তো তাঁর অভিযানের লক্ষ্য অন্য কোথাও, দুশমনকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তিনি আল খালিদের দিকে যাচ্ছেন। হয়তো তার টার্গেট খৃস্টান বাহিনী। আমার রাজ্যের পাশে তারা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। হয়তো সে খবর পেয়েই তিনি সেদিকে তার বাহিনী ছুটিয়েছেন। আপনি বিষয়টি খৃস্টানদের জানাননি?'

'না, খৃষ্টানদের প্রতি আমার কোন বিশ্বাস নেই।' ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'তারা আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। সেই সাহায্য তারা দিচ্ছেও। কিন্তু তাদের নিয়ত আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

তারা সমরাস্ত্র ও উপদেষ্টা দিতে আমাকে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু আমি যখন তাদের বললাম, 'আপনারা দামেশক ও বাগদাদে অভিযান চালিয়ে শহর দুটো দখল করে নিন, কারণ সুলতান এখন সেই শহর দুটো থেকে অনেক দূরে। আর তার কাছে এ দুটো শহর হচ্ছে তার হৃদপিন্ড। আপনারা এ দুটো দখল করলে তার হৃদপিন্ড আপনাতেই স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

তারা আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করে বললো, 'যদি আইয়ুবী তা উদ্ধার করতে ছুটে আসে? কারণ আমরা যেমন জানি, তিনিও তেমন জানেন দামেশক ও বাগদাদ তার হৃদপিন্ড। তিনি কিছুতেই তা হারাতে চাইবেন না। জেনেশুনে কেন আমরা

সাপের লেজে পা রাখতে যাবো?'

আমি বললাম, 'সালাহউদ্দিনকে আমরা সে সুযোগ দেবো না। তিনি রওনা হওয়ার সাথে সাথে আমার এবং হলবের বাহিনী তার ওপর কমান্ডো অভিযান চালিয়ে তাকে অকেজো করে দেবো। তিনি যখন আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবেন তখন দেখবেন তার হাত-পা সবই পঙ্গু হয়ে গেছে। তার চোখের আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই আপনাদের আঘাত করতে পারবে না।' কিন্তু তারা তাতে রাজি হলো না। আমি বুঝে পাই না, আইয়ুবীকে পরাজিত করার এমন একটা মওকা তারা কেন গ্রহণ করলো না।'

'তারা আপনার পরামর্শ গ্রহণ করলে আইয়ুবী আমাদের রেখে তাদের দিকেই ধাবিত হবে, এই সহজ কথাটা তাদের না বুঝার কথা নয়। তারা দামেশক ও বাগদাদের দিকে অভিযান চালালে বাধ্য হয়েই আইয়ুবীকে আমাদের এলাকা ছাড়তে হবে। কিন্তু খৃস্টানরা তা চায় না। তারা চায় আইয়ুবীর সাথে লড়াইটা যেন আমরাই করি। তাহলে আইয়ুবীর সাথে আমাদেরও শক্তি ক্ষয় হবে।' শাহ আরমান বললেন।

'তারা আমাদের সকলকেই অধীনস্ত করতে চায়।' কুতুবুদ্দিন গাজী বললেন, 'সুলতান আইয়ুবী যদি না থাকতো এতদিনে তারা আমাদের সবাইকে গিলে ফেলতো। আমি আমীর ইয়াজউদ্দিনের সাথে একমত, তাদের ওপর নির্ভর করা আমাদের কখনো উচিত হবে না।'

'এ জন্যই আমি বলি, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।'

ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'আমি অগ্রসর হয়ে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধ শুরু করলে আপনারা তার ওপর পিছন থেকে আক্রমণ চালান।'

এই নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হলো। শেষে শাহ আরমান শর্ত আরোপ করলেন, তার সৈন্য ও ঘোড়াগুলোর আহার ও যত্নের দায়িত্ব ইয়াজউদ্দিনকে নিতে হবে।

ইয়াজউদ্দিন এই শর্ত মেনে নিলেন। সিদ্ধান্ত হলো, ইয়াজউদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর সামনা সামনি যুদ্ধ করবেন, শাহ আরমানের বাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ চালাবেন সুলতান আইয়ুবীর উপর।

ইয়াজউদ্দিন একজন দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি বৈঠক শেষ করে সেই রাতেই যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে বসলেন। শাহ আরমানও বসলেন তার সাথে। দুই যুদ্ধবাজ তখনো আইয়ুবীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা করছেন। রাত তখন প্রায় অর্ধেক পার হয়ে গেছে।

মধ্য রাতের একটু পর। ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমান যুদ্ধের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, হঠাৎ অশ্ব পদধ্বনিতে রাতের প্রহর কেঁপে উঠলো। শাহ আরমান প্রহরীকে ডেকে রাগের সাথে বললেন, 'এখন যে আরোহী ঘোড়া খুলে পালাচ্ছে সকালে তাদের এখানে ধরে নিয়ে আসবে। আমি বেটাদের শুলে চড়াবো।'

কিন্তু ঘোড়ার এ আরোহীরা তার সৈন্য ছিল না। এরা ছিল সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীর অশ্বারোহী দল। সংখ্যায়

মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশজন।

এটা ছিল তাদের রাতের দুর্ধর্ষ এক অতর্কিত আক্রমণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহলের বাইরে সেনা ছাউনিতে কিয়ামত সৃষ্টি হয়ে গেল। সুলতানের কমান্ডো বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়ে ঝড়ের মত ওদের তাবুগুলোর এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। তাদের হাতে ছিল জ্বলন্ত মশাল। তারা সেখানে সৈন্যদের তাবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। মুহূর্তে জ্বলে উঠলো ঘুমন্ত সৈন্যদের তাবুগুলো।

আগুনের উত্তাপ, ঘোড়ার খুরের দাপাদাপি, সঙ্গীদের হাক ডাক ও চিৎকারে ঘুমন্ত সৈন্যরা হুড়মুড় করে উঠে বসলো। তারা ভয়, আতংক ও প্রাণের মায়ায় আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য পড়িমরি করে বের হলো তাবুগুলো থেকে। হাতিয়ার হাতে নেয়ার কোন অবকাশই পেলো না তারা।

এ সময়ই এলো দ্বিতীয় আঘাত। আইয়ুবীর অশ্বারোহীদের দ্বিতীয় দলটি বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে তরঙ্গের মত ছুটে এলো হতবিহ্বল সৈন্যদের দিকে। সামনে যাকে পেলো তাকেই শুইয়ে দিল চিরদিনের মত। কেউ লুটিয়ে পড়লো কমান্ডোদের তলোয়ারের আঘাতে, কেউ বর্শায় বিদ্ধ হয়ে।

ঝড়ের মত এসে ঝড়ের বেগেই আবার তারা চলে গেল। এরপর শুরু হলো জ্বলন্ত তাবুর আলোয় ছুটে বেড়ানো সৈন্যদের লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ। এই তীরের মধ্যে সলতেওয়ালা জ্বলন্ত তীরও ছিল।

আরেক দল কমান্ডো গেল আস্তাবলের দিকে। তারা বাঁধা ঘোড়া

ও উটগুলোর রশি আলগা করে আগুন লাগিয়ে দিল আস্তাবলে। শুরু হলো ভয়ার্ত পশুদের ছুটোছুটি। একদল অশ্বারোহী তাদের তাড়িয়ে দিল সৈন্যদের তাবুর দিকে।

ছুটন্ত ঘোড়া ও উটের পায়ের নিচে পিষে যেতে লাগলো সৈন্যদের লাশ। রাতের নিরবতা খান খান হয়ে গেল আহত পশু ও মানুষের মরণ চিৎকারে। এই শোরগোল, দাউ দাউ আগুনের শিখার আতংক, আহতদের আর্ত চিৎকার, ঘোড়া ও উটের ছুটাছুটিতে ক্যাম্পের আশপাশের পরিবেশ বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো।

এ সময় অন্ধকার থেকে ভেসে এলো গুরুগম্ভীর এক কণ্ঠস্বর, 'বাঁচতে চাও তো অস্ত্র সমর্পন করো। ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমান আমাদের সামনে এসো। শাহ আরমান, তোমার রাজধানী আল খালিদে তুমি আর কোনদিন ফিরে যেতে পারবে না। আল খালিদ এখন আমাদের সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। তুমি আল খালিদে নেই, তোমার সৈন্যরা আমাদের অবরোধের মধ্যে পড়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছে। জলদি করো, তাড়াতাড়ি এসে আত্মসমর্পন করো। নইলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য আমাদের দায়ী করতে পারবে না।'

ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমান কেউ এই বিভীষিকার মধ্যে সামনে আসার সাহস পেল না। ইয়াজউদ্দিন তার এক বিশ্বস্ত কমান্ডারকে বললেন, 'তুমি আমাকে যেভাবেই পারো একটা ঘোড়া জোগাড় করে দাও।'

কমান্ডার অনেক কষ্টে কোন মতে একটি ঘোড়া এনে তাকে

দিল। তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য থেকে বের হয়ে গেলেন। পেছনে পড়ে রইলো তার বিশাল বাহিনী, তার নিজস্ব অফিসারবৃন্দ ও তার সঙ্গে আসা দাসদাসী সব। এদের কারো কথা স্মরণ করারও অবকাশ পেলেন না তিনি। নিজের জীবন নিয়ে একাকী পালিয়ে গেলেন, এমনকি সেই কমান্ডারকেও সঙ্গে নিলেন না।

বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুলতান আইয়ুবী চাইলে তার অবরোধ এমন কঠিন করতে পারতেন যে, কেউ সেই অবরোধ ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতো না। কিন্তু তিনি তা করেননি। এর কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তিনি গাদ্দার শাসকদেরকে তার দলভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের সৈন্যদেরকে নিজের বাহিনীর সঙ্গে শামিল করতে চাচ্ছিলেন। কারণ ফিলিস্তিন উদ্ধার করতে অনেক সৈন্যের প্রয়োজন ছিল।

১১৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এই যুদ্ধে সুলতান আইয়ুবী শুধু কমান্ডো বাহিনীর সহায়তায় এমন বিজয় লাভ করলেন যে, তিনি সামনে এগিয়ে কাউকে গ্রেফতার করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই কমান্ডো বাহিনীর কমান্ড করেছিলেন তিনি নিজে।

শাহ আরমান এই ঘটনায় এতটাই বিহবল হয়ে পড়লেন যে, তিনি পালাবার কথাও চিন্তা করতে পারলেন না। তিনি পাথরের মূর্তির মত ঠাঁয় বসে রইলেন তার কামরায়।

সৈন্যরা ঘোষণা শোনার পর হাতিয়ার তুলে নেয়ার পরিবর্তে আত্মসমর্পন করাই শ্রেয় মনে করলো। তারা কোন রকম প্রতিরোধ না গড়ে আত্মসমর্পন করলো।

মাত্র পঞ্চাশজন কমান্ডোর কাছে আত্মসমর্পন করলো ইয়াজউদ্দিনের দুই ডিভিশন এবং শাহ্ আরমানের তিন ডিভিশন সৈন্য। কমান্ডোরা তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বুঝে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এই ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে গেল রাত। সকাল হলো। ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমানের সৈন্যরা তাকালো তাদের ক্যাম্পের দিকে। তাবুগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিহত সৈনিকদের লাশ। যারা কমান্ডোদের তলোয়ার, তীর বা বর্শার আঘাতে আহত হয়েছিল কিন্তু তখনো মরেনি, তারা ছটফট করছিল। তারা আশপাশে তাকিয়ে দেখলো, মুক্ত ঘোড়া ও উটগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাছেপিঠে আক্রমণকারীদের কেউ নেই।

এতে তারা সত্যি খুব বিস্মিত হলো। তারা বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে শাহ আরমানকে জানালো। এক কমান্ডার শাহ আরমানকে গিয়ে বললো, 'জানিনা কাল রাতে আমাদের ওপর ভূতেরা হামলা করেছিল কিনা? আইয়ুবীর কোন সৈন্যই আশপাশে নেই।'

শাহ আরমান জানতেন, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা এখানেই আশেপাশে কোথাও আছে। তিনি বললেন, 'গর্দভ, বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে সুলতান আইয়ুবী কোথায় আছে জানতে চেষ্টা

করো।'

কমান্ডার সরে গেল সেখান থেকে। তিনি সুলতান আইয়ুবীকে কোথায় পাওয়া যায় চিন্তা করতে লাগলেন। এক সময় তিনি দেখতে পেলেন, দূর থেকে দুই অশ্বারোহী মহলের দিকেই ছুটে আসছে। তিনি বারান্দায় বসে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অশ্বারোহী দু'জন শাহ আরমানের সামনে এসে নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে। তারপর এগিয়ে তাকে সালাম করে বললো, 'আমরা সুলতান আইয়ুবীর পক্ষ থেকে এসেছি। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।'

তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাদের বসতে বললেন। আগন্তুক অশ্বারোহীদের একজন বললো, 'সুলতান আইয়ুবী কাউকে গ্রেফতার করতে চান না। তিনি বলেছেন, ইয়াজউদ্দিন ইচ্ছে করলে মুশেলে চলে যেতে পারে। তবে যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে তিনি যেন ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে নেন। আর আপনার ব্যাপারে সম্মানিত সুলতান একটি চিঠি দিয়েছেন।'

এক অশ্বারোহী এগিয়ে শাহ আরমানের হাতে চিঠি হস্তান্তর করলো। চিঠিতে তিনি শাহ আরমানকে জানিয়েছেন, 'আমার সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যে আল খালিদের কাছে পৌঁছে গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ এ ব্যাপারে আপনি আপনার লোকদের কাছ থেকেই খবর পেয়ে যাবেন।

আপনার আল খালিদে পৌঁছার আগেই আপনার রাজধানী আমার অধীনে চলে আসবে। যদি আপনি মিশর ও সিরিয়ার সুলতানের

শর্ত মেনে নেন তবে আল খালিদ থেকে আমার সৈন্য আমি প্রত্যাহার করে নেবো। আর যদি আপনি যুদ্ধ করতে চান তবে তার পরিণতি সম্পর্কে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে নেবেন।

আমি আপনার কাছ থেকে এ চিঠির জবাবের অপেক্ষা করছি। আপনি এখন আমার অবরোধের মধ্যে থাকলেও আমি আপনার ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। তাই আপনার সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ।'

'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে আমার সালাম বলবেন।' শাহ আরমান বললেন, 'আমি আমার এক উজিরকে সন্ধ্যার আগেই সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন?'

'আপনি আপন্যর উজিরকে বলবেন, তিনি যেন রওনা হয়ে সোজা পূব দিকে আধা ঘন্টা এগিয়ে যান। আমাদের লোক এ সময়ের মধ্যেই তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। তারাই তাঁকে সুলতানের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

অশ্বারোহী দু'জন চলে গেল। শাহ আরমান তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী বোকতামিয়াকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী বোকতামিয়া এলে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি সুলতান আইয়ুবীকে বলবে, আপনার বিরুদ্ধে কোন রকম শত্রুতায় আমরা আর নেই। বিভিন্ন আমীরদের প্ররোচনায় যে ভুল আমরা করেছি তাতে আপনি যদি আমাদের রাজধানী দখল করে নিতেন বা শাহ আরমানকে গ্রেফতার করে এনে তাকে হত্যা করতেন তবু আমাদের করার কিছু ছিল না। কিন্তু এটা আপনার

অপরিসীম মেহেরবানী ও দয়া যে, আপনি এর কোনটাই করেননি।

যদিও আমাদের রাজধানী আল খালিদ আপনার অবরোধের মধ্যে পড়ে আছে আর আমরাও এখানে আপনার বেষ্টনীর মধ্যে আছি তবু আপনি আমাদের ওপর যে রহম করেছেন তার বদলা আমরা দিতে চাই। আপনি যদি সে সুযোগ আমাদের দেন, আমরা ওয়াদা করছি, আমরা আর কখনো আপনার বিরোধী পক্ষের ফাঁদে পা দেবো না।

আপনি বলেছেন, আপনার শর্ত মেনে নিলে আপনি আল খালিদ থেকে আপনার সৈন্য সরিয়ে নেবেন। শাহ্ আরমান আপনার শর্ত মেনে নিয়েছেন। তিনি ওয়াদা করেছেন, আপনার কোন শত্রুকে তিনি আশ্রয় দেবেন না এবং তাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তিও করবেন না। আপনার শত্রুদের সাথে সামরিক জোট গঠন করার কোন অভিপ্রায়ও তার নেই।'

বোকতামিয়া ছিলেন বুদ্ধিমান উজির। তিনি সুলতান আইয়ুবীর সাথে দেখা করলেন। তাকে জানালেন শাহ আরমানের অভিপ্রায়। সুলতান আইয়ুবীও কঠিন শর্ত আরোপ করে বললেন, 'তিনি কি আপনাকে আমার সাথে যে কোন শর্তে সন্ধি করার ক্ষমতা দিয়েছেন?'

বোকতামিয়া সুলতানকে শাহ আরমানের পক্ষ থেকে লিখিত ক্ষমতাপত্র দেখিয়ে বললেন, 'আপনার যে কোন শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করার লিখিত অনুমতি তিনি আমাকে দিয়েছেন।'

সুলতান অনুমতিপত্রটি দেখলেন এবং বললেন, 'তাহলে

আপনাকেও লিখিত অঙ্গীকারনামায় সই করতে হবে।'

উজির বোকতামিয়া লিখিত অঙ্গীকারনামায় সই করে সুলতান আইয়ুবীর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন। সন্ধির মূল শর্ত ছিল, 'শাহ আরমান আর কখনোই সুলতানের শত্রুদের সাথে গোপনে বা প্রকাশ্যে যোগাযোগ করবেন না এবং তারা যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তাদের প্রশ্রয় দেবেন না।

দ্বিতীয় শর্ত ছিল, যারা স্বেচ্ছায় মসজিদুল আকসা মুক্ত করার জেহাদে শরীক হতে চায় সে সব সৈন্যদের সুলতানের বাহিনীতে শামিল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।'

উজির বোকতামিয়ার মাধ্যমে শাহ আরমান এই শর্ত মেনে নেয়ায় সুলতান আইয়ুবী সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। তিনি তার এক সেনাপতিকে পাঠালেন উজিরের সাথে। উজিরসহ সেনাপতি গেলেন ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমানের উদগ্রীব সৈন্যদের ওখানে। তিনি তাদের জানালেন সন্ধির শর্ত। ইয়াজউদ্দিনের অধিকাংশ সৈন্য এবং শাহ আরমানের সৈন্যদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সুলতানের সাথে জেহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি সেই সব সৈন্যদের নিয়ে সেখান থেকে বিদায় হলেন।

সন্ধ্যার একটু পর। সুলতান আইয়ুবী যে পরিমাণ সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে বেরিয়েছিলেন তারচে কয়েকগুণ বেশী সৈন্য নিয়ে শাহ আরমানের সাথে সাক্ষাত না করেই আল খালিদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

সন্ধির শর্ত মোতাবেক তিনি আল খালিদ থেকেও অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। সেখান থেকেও শাহ্ আরমানের বিপুল সংখ্যক সৈন্য সুলতানের সহযোগী হলো।

সুলতান তাদের নিয়ে গেলেন আল খালিদের অদূরে এক বিশাল পাহাড়ের উপত্যকায়। সেখানেই তিনি সৈন্যদের ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়ে পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা করতে বসলেন।

মরু আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাইয়ারে বাকা। সে যুগে অঞ্চলটি আরবের একটি উৎকৃষ্ট অঞ্চল বলেই বিবেচিত হতো। সামরিক দিক থেকে অঞ্চলটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আরো একটি কারণে সারা আরব জুড়ে এ এলাকাটি ছিল মশহুর। এ অঞ্চলের লোকেরা যুদ্ধ বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। তাদের শারিরীক গঠনও ছিল মজবুত। সহজেই তারা যুদ্ধের রণকৌশল রপ্ত করে নিতে পারতো। ফলে যে কোন সেনাবাহিনীতেই ছিল তাদের বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্য বিভাগেও এ অঞ্চলের অনেক সৈন্য শামিল ছিল। সুলতান তাঁর সৈন্যদলের ঘাটতি এ অঞ্চল থেকেই পূরণ করতে চেষ্টা করতেন।

এখানকার জনসাধারণও সাধারণভাবে সুলতান আইয়ুবী সমর্থক ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের শাসনকর্তা তার শাসন কার্যে কারো কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।

তিনি স্বাধীনভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং সুলতান আইয়ুবীকে মনে করতেন নিজের কর্তৃত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই তিনি সুলতান আইয়ুবীকে পছন্দ করতেন না। ফলে

মুসলমান হয়েও তিনি খৃষ্টানদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব কায়েম রাখতে চেষ্টা করতেন।
রাতে সুলতান সেনাবাহিনীর উর্ধতন অফিসারদের নিয়ে বসলেন এবং তাদের জানালেন তিনি দাইয়ারে অভিযান চালাতে চান।
সেনা কমান্ডাররা সবাই সুলতানের সাথে একমত পোষণ করলে তিনি তাদের বললেন, 'তাহলে আমি আর এক মুহূর্তও কালক্ষেপন করতে রাজি নই। তোমরা প্রস্তুত হও। আজ রাতেই আমরা দাইয়ারে বেকারের দিকে রওনা হবো।'

শেষ রাত। সুলতান আইয়ুবী তাঁর বাহিনীকে দাইয়ারে বেকারের দিকে অভিযান চালানোর আদেশ দিলেন। সেনাপতিদের বললেন, 'এটা হবে বিদ্যুৎ গতির এক অভিযান। আমরা এখানেও ঝটিকা আক্রমণ চালাবো এবং কোন রকম অবরোধে না গিয়ে সরাসরি আঘাত হেনে দাইয়ারে বেকারকে দখল করে নেবো।
দাইয়ারে বেকারের বর্তমান আমীর কোন রকম শর্ত আরোপ করতে চাইলেও সেদিকে কর্ণপাত করার দরকার নেই তোমাদের। তার কোন আবেদন বা শর্তই গ্রহণ করা হবে না।'
তিনি আরো বললেন, 'তার প্রতি কোন রকম দয়া দেখানোরও দরকার নেই তোমাদের। সোজা আঘাত হানবে এবং তাকে উৎখাত করবে।'
'কিন্তু আপনি যেভাবে ইয়াজউদ্দিন ও শাহ আরমানের সাথে আচরণ করেছেন তাতে কিন্তু আমরা যথেষ্ট লাভবান হয়েছি।

আমার মনে হয়, দাইয়ারে বেকারের আমীরের সাথেও একই রকম আচরণ করা যেতে পারে।' এক সেনাপতি বললো।
সে আরো বললো, 'তাতে করে তার সৈন্য বাহিনীকেও আমরা সহজেই নিজের বাহিনীর সাথে যুক্ত করে নিতে পারবো। তখন তাকে নাম মাত্র আমীর রাখলে সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'
'আমি এখন আর কোন সাপকে আস্তিনের ভেতর রেখে পালন করার পক্ষপাতি নই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি সংবাদ পেয়েছি, এই ব্যক্তি তার এলাকা থেকে কোন লোককে আমার সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে দিচ্ছে না। সে প্রকাশ্যে বাগদাদের খেলাফতের অধীন প্রচার করলেও গোপনে খেলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।
সব সময় মনে রাখবে, কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা দাবী করা ও গোপনে গোপনে পৃথক হওয়ার ষড়যন্ত্র করা লোক জাতির গাদ্দার হয়। আর এ গাদ্দাররা খুবই ভয়ংকর হয়। তারা জাতির শত্রুদের থেকে সাহায্য কামনা করে এবং জাতির খেলাফতের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করে।
আমি এ ধরনের লোকদের মাথা গুড়িয়ে দিতে চাই। যাতে যখন আমাদের আসল শত্রু খৃস্টান আমাদের সামনে আসবে তখন আমাদের পিঠে এইসব কাল সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে ছোবল মারতে না পারে।'
দাইয়ারের বাকার আল্লাহ্‌র সৈনিকদের এলাকা। আমার সৈন্য বিভাগের এক চতুর্থাংশ সৈন্যই এ এলাকার লোক। যদি আমি

এই গাদ্দার সরকারকে ক্ষমা করে দেই তবে এ এলাকার লোকদের ঈমান নষ্ট হতে থাকবে। সেই সাথে তাদের জেহাদী জযবাও নষ্ট হয়ে যাবে।'

তিনি আরো বললেন, 'একটি দেশের বা কোন জাতির সমস্ত লোক গাদ্দার বা বেঈমান হয় না। বেঈমান হয় কতিপয় লোক, যারা শাসন ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই শাসক গোষ্ঠী গাদ্দার হলে ক্ষতি হয় সমগ্র জাতির। মাত্র ক'জন লোকের জন্য নষ্ট হয়ে যায় জাতির গৌরব।

একটি গৌরবময় জাতি তখন তার সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। যখন তাদের মহত হওয়ার আবেগ ও প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে জাতি আর স্বাধীন ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না।

আমাদের মধ্যে এ ধরনের শাসক ও আমীরদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলে জাতি হিসাবে আমরা শেষ হয়ে যাবো। আজ খেলাফাতের কেন্দ্রীয় শাসন শীথিল হয়ে গেছে। যদি খেলাফাতের শাসন দৃঢ় ও অটুট থাকতো তবে আমাকে এভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হতো না।

এটা সৈনিকদের নৈতিক দায়িত্ব যে, তারা রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী, গাদ্দার ও অযোগ্য শাসককে প্রশ্রয় দেবে না। আমি আবারও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদি তোমরা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তবে ইতিহাস বলবে, তোমরা ছিলে অকর্মন্য, অলস ও অথর্ব। তোমরা ইসলামী খেলাফত টিকিয়ে রাখতে পারোনি। পারোনি জাতির সম্মান ধরে রাখতে,

পারোনি শত্রুদের মুকাবেলা করতে।'

দাইয়ারে বাকার। আইয়ুবীর বাহিনী এত দ্রুত দাইয়ারে বাকারে আঘাত হানলো যে, ভেতরের সৈন্যরা তাদের গতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, 'আঘাত এলে অবশ্যই তার মোকাবেলা করবে কিন্তু অযথা রক্তক্ষয় করবে না। সব সময় খেয়াল রাখবে, বেসামরিক নাগরিকরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।'

দাইয়ারে বাকারে সুলতানের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী আগে থেকেই মজুত ছিল। তাদের মাধ্যমে সুলতান আইয়ুবী পূর্বেই জেনে নিয়েছিলেন কোথায় আছে শহরের সরকারী স্থাপনা, আর্মি হেড কোয়ার্টার এবং সরকারী গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলো।

তিনি দাইয়ারে বাকারে পৌঁছেই সেই সব জায়গায় মেনজানিক দিয়ে পাথর ও পেট্রোল বোম নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন যেখানে শুধু সেনা ছাউনি, সরকারী অফিস ও মহল ছিল।

মেনজানিক নিক্ষেপের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সেনাপতিদের মাধ্যমে এই ঘোষণা প্রচার করতে লাগলেন, 'শহরের আমীর, অস্ত্র সমর্পণ করে বাইরে চলে এসো নইলে শহর গুড়িয়ে দেয়া হবে।'

কিন্তু কেল্লার অধিপতি যেমন ছিল উচ্চাভিলাষী তেমনি ছিল একগুঁয়ে ও গোয়ারগোবিন্দ। তিনি অস্ত্র সমর্পন না করে প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'অস্ত্র সমর্পন করা হবে না। তোমরা পারলে যুদ্ধ করে শহর দখল করে নাও।

সেনাপতির অনুপ্রেরণায় দাইয়ারে বাকারের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলো। সুলতান আইয়ুবী প্রতিরোধের ধরণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এতটা দৃঢ়তা তিনি আশা করেননি।

অবরোধ কর্মে নিপুন ও অভিজ্ঞ আইয়ুবী দাইয়ারে বাকারের সৈন্যদের প্রবল বাঁধা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার অভিজ্ঞতা তাকে বললো, এ অবরোধ দীর্ঘায়িত হবে এবং এ জন্য একটু বেশী কোরবানী দিতে হবে।

তিনি রাতের অন্ধকারে একদল সৈন্যকে শহরের দেয়াল ভাঙ্গার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এই দলটি ছিল আকারে ক্ষুদ্র। মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূর দিয়ে এই বাহিনী শহরের মূল ফটকের উল্টো দিকে চলে গেল।

তারা পেছন দিকের দেয়াল ভেঙ্গে শহরে প্রবেশ করতে চাইলো। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। শহরের সৈন্যরা পাঁচিলের ওপর থেকে দেয়াল ভাঙ্গা বাহিনীর উপর অগ্নি-তীর ও ভারী পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে পিছু হটতে হলো ওদের।

এরপর আইয়ুবী বড় গেটের উপর মেনজানিক দিয়ে পেট্রোলের হাড়ি নিক্ষেপ শুরু করলেন। সলতেওয়ালা অগ্নি তীর বর্ষণ করায় দরজার কাঠের অংশ পুড়ে গেল। কিন্তু তার লোহার কাঠামোটি অক্ষতই রয়ে গেল।

কাঠ পুড়ে যাওয়ায় যেটুকু ফোঁকড় তৈরী হলো সেখান দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা কঠিন। তবুও আইয়ুবীর সৈন্যরা সেদিক দিয়ে বার কয়েক প্রবেশের চেষ্টা করলো। [illegible] তাদের এ

চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। কারণ শহরের সৈন্যরা প্রতিবারই প্রবল তীর বর্ষণ করে ওদের তাড়িয়ে দিল।

সুলতান আইয়ুবী আশ্চর্য হলেন ভেতরের সৈন্যদের এমন মরণপণ লড়াই দেখে। এর রহস্য পরে জানা গেল। দাইয়ারে বাকারের আমীর অবরোধের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, 'খৃষ্টান সৈন্যরা শহর অবরোধ করেছে।'

এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে জনগণ ও সৈন্যদের মাঝে জেহাদী জযবা জেগে উঠে। তারা মরণপণ করে যুদ্ধ করার শপথ নিয়ে ময়দানে নেমে আসে।

ফলে সৈন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সহযোগিতা করতে থাকে শহরের জনগণ। দেয়ালের উপর থেকে অবরোধকারীদের উপর তীর বর্ষণ চলতে থাকে অবিরাম।

শহরের চারদিকেই সৈন্যদের সাথে হাত মিলায় জনতা। ফলে সৈনিকদের উৎসাহ বেড়ে যায় বহুগুণ। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা তীরের সাথে কাগজের টুকরো বেঁধে কৌশলে এই খবর জানিয়ে দেয় সুলতানকে।

শহরের জনতার এই উদ্দীপনার খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী নিজের বাহিনীকে সংযত করে নেন। তিনি নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ রোধ করার জন্য যুদ্ধরত সৈন্যদের শহরে অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফলে অবরোধের সময় বেড়েই চললো।

অবরোধের আজ আট দিন। এক সপ্তাহ ধরে অবরোধ করেও সুবিধা করতে পারেননি আইয়ুবী। বরং বেশীর ভাগ ক্ষয় ক্ষতি সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদেরই হচ্ছিল। কারণ তারা সামনে

অগ্রসর হলেই প্রতিপক্ষের তীর ছেঁকে ধরতো তাদের।

অষ্টম দিনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা দুঃসাহসিক এক কাজ করে বসলো। এ কয়দিন সেও শহরের সৈন্যদের সাথে লড়াইতে অংশ নিয়ে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিল।

সে দেয়ালের উপর উঠে বাইরের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'এরা খৃস্টান বাহিনী নয়, সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী!' সে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাদের পতাকা দেখো, ওই যে ইসলামী নিশান উড়ছে!'

পাঁচিলের ওপর দাঁড়ানো সৈনিকরা গভীর আগ্রহ ও কৌতুহল নিয়ে তাকালো সেদিকে। সত্যি তো, এ যে আইয়ুবীর বাহিনী!

সে উপস্থিত সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললো, 'মুসলমান বন্ধুগণ! আমরা এতদিন আপোষে লড়াই করেছি। ওদের কাছে আসতে দাও। ওরা কি বলতে চায় শুনি।'

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা এরপর আবার এগুলে পাঁচিলের ওপর থেকে তাদের ওপর তীর বর্ষণ না করে তাদের কাছে আসতে দিল। তারা নিকটবর্তী হলে এক সৈনিক চেঁচিয়ে বললো, 'তোমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈনিক? তোমরা এখানে কি জন্য এসেছো, কি চাও তোমরা?'

এই এলাকার যেসব সৈন্য সুলতানের বাহিনীতে ছিল তারা এ প্রশ্নের জবাবে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, আমরা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য। আমরা তোমাদেরই সন্তান, তোমাদের ভাই।'

তারা চিৎকার করে বললো, 'তোমাদের আমীর খৃষ্টানদের সাথে হাত মিলিয়েছে। সুলতান আইয়ুবী নিজে এই গাদ্দারকে শায়েস্তা করতে এসেছেন। দয়া করে দরজা খুলে দাও। আমরা যুদ্ধ করেই কেল্লা দখল করতে পারতাম। কিন্তু তোমাদের জানমালের ক্ষতি হবে বলে সুলতান আমাদেরকে চরম আঘাত হানার অনুমতি দিচ্ছে না।'

এ ঘটনায় যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি পাল্টে গেল। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা এ কয়দিন ধরে গোপনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লোকদের বুঝাতে চেষ্টা করছিল, আক্রমণকারীরা খৃষ্টান নয়, মুসলমান।

তারা জনসাধারণকেও বলতে চাচ্ছিল, এরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যবাহিনী। কিন্তু গোয়েন্দাদের পক্ষে প্রকাশ্যে এ কথা বলা সম্ভব ছিল না। এতে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নতুন এই বুদ্ধি তাদের সাফল্য এনে দেয়।

এ ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর শহরের লোকদের, এমনকি সৈন্যদেরও চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা দাইয়ারে বাকারের আমীর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের শাসানি ও ধমক অগ্রাহ্য করে শহরের দরজা খুলে দিল। সুলতান আইয়ুবী শহরে স্বসৈন্যে প্রবেশ করলেন।

শহরের জনতা অধীর আগ্রহে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। শহরের মহিলারা জানালা ও ছাদের উপর থেকে তাদের রুমাল নেড়ে ও ফুল ছুঁড়ে সম্বর্ধনা জানালো

আইয়ুবীকে।
সুলতান আইয়ুবী দাইয়ারে বাকারের আমীরকে তার সাঙ্গ পাঙ্গসহ শহর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। দাইয়ারে বাকারের আমীর তাকে হত্যা না করে এভাবে ছেড়ে দেয়ায় নিজেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে দাইয়ারে বাকার ত্যাগ করলেন তিনি। সুলতান আইয়ুবী তার স্থলে নুরুদ্দিন ইবনে কারা আরসালানকে দাইয়ারে বাকারের নতুন আমীর নিয়োগ করলেন।
এই নূরুদ্দিন ছিলেন মরহুম নুরুদ্দিন জঙ্গীর বংশের লোক। সুলতান তাকে বললেন, 'জরুরীভাবে এই এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করো।'
সুলতান আইয়ুবী দাইয়ারে বাকারের সমস্ত সৈন্য নিজের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শামিল করে নিয়ে বললেন, 'ওদের আমি নিয়ে গেলাম। নতুন সৈন্য ভর্তি করে ওদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। তোমার এলাকার হেফাজতের জন্য তারাই যথেষ্ট হবে। আমি সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকজন দক্ষ প্রশিক্ষক রেখে যাচ্ছি।'
১১৮৩ সালের মে মাস। সুলতান আইয়ুবী দাইয়ারে বাকার এলাকাকে তার অধীনস্ত প্রদেশ ঘোষণা করে পরবর্তী অভিযান চালালেন হলবের দিকে।
ততোদিনে হলব ও মুশেল ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত আমীর ও কেল্লা প্রধানরা আইয়ুবীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। হলবের আমীর ইমাদুদ্দিন ও মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিন তখনো

দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছিল না।

একদিকে আইয়ুবীর ভয় তাদের বলছিল, এখনো সময় আছে, গাদ্দারীর পথ ছেড়ে আইয়ুবীর বশ্যতা মেনে নাও। আবার ক্ষমতার মোহ ও খৃস্টানদের আশ্বাস বলছিল, যতক্ষণ খৃস্টানদের বিশাল বাহিনী তোমাদের পাশে থাকবে ততোক্ষণ নিজের ক্ষমতার মোহ তোমরা ত্যাগ করতে পারো না।

সুলতান মনে মনে ভেবে দেখলেন, এই দুই কালসাপকে এবার উচিত শিক্ষা দেয়ার সময় এসেছে।

বিজয় লাভের পর মানুষের চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলা করাটাই স্বাভাবিক। সুলতান আইয়ুবীও কোন যুদ্ধে বা অবরোধে জয়লাভ করলে তার চেহারায় ফুটে উঠতো আনন্দের আভা। তাঁর সৈন্যদের মাঝেও দেখা যেতো উৎসব মুখরতা।

সৈন্যরা খুশীতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরতো। আয়োজন করা হতো নানা রকম অনুষ্ঠান। সৈন্যরা সেখানে জেহাদী গান গাইতো। শারিরীক কসরত ও কৌশল দেখাতো। খাসি, দুম্বা ও উট জবেহ করে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হতো।

সৈন্যরা স্বেচ্ছায় গিয়ে সে রান্নায় নিজেরা হাত লাগাতো। তারপর যখন সৈন্যরা সে খাবার তৃপ্তি সহকারে খেতে বসতো সুলতান আইয়ুবী ঘুরে ঘুরে তা তদারক করতেন। কখনো অংশ নিতেন পরিবেশনায়। সৈন্যদের পাতে এটা ওটা তুলে দিতেন। কারো কিছু লাগবে কিনা খোঁজখবর নিতেন। এতে

সৈন্যদের আনন্দ যেনো দ্বিগুণ হয়ে যেতো।

কিন্তু ১১৮৩ সালের উপর্যুপরি সাফল্যে সুলতানের মুখে কোন আনন্দের আভাস দেখা গেল না। এই এক বছরে তিনি অনেকগুলো কেল্লা ও এলাকায় অভিযান চালিয়েছেন। প্রতিটি অভিযান থেকেই তিনি বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। শাহ আরমানের মত পরাক্রমশালী শাসককে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। বাধ্য করেছেন তাকে লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বশ্যতা স্বীকার করতে।

ঐতিহাসিকরা এই সময়টাকে সুলতান আইয়ুবীর বিজয়ের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তার আবেগ ও প্রেরণায় এই বিজয়ের কোন প্রভাব পাওয়া যেতো না।

বরং প্রতিটি বিজয়ের পর তাঁর চেহারায় আনন্দের পরিবর্তে দেখা দিত বিমর্ষতার ছাপ। উদাসীনতায় মলিন হয়ে যেতো তাঁর পৌরুষদীপ্ত চেহারা। তিনি এর একটাকেও সফলতা বলে মনে করতে পারতেন না। কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সালেম মিশরী কখনো বিজয়ীর ভঙ্গিতে সুলতানকে রিপোর্ট দিতেন, 'গতরাতে আমাদের কমান্ডো সৈন্যরা অমুক স্থানে হামলা চালিয়ে শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।'

সুলতান আইয়ুবী রিপোর্ট শুনে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তার সন্তোষ প্রকাশ করতেন। কিন্তু দেখা যেতো পরক্ষণেই তাঁর চেহারা দুশ্চিন্তা ও বিমর্ষতায় ছেয়ে গেছে। মনে হতো তার অন্তরে বেদনারা কিলবিল করছে। তিনি এমন কষ্ট পাচ্ছেন যা তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

একদিন তিনি সালেম মিশরীকে বললেন, 'সালেম, এভাবে ভাইদের ওপর বিজয়ী হওয়ার খবর তুমি আর কত শোনাবে আমাকে? আমি তো তোমার কাছ থেকে সেই সুসংবাদ শুনতে চাই, তোমরা তোমাদের দুশমন খৃষ্টানদের পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে এসেছো।'

দাইয়ারে বাকার বিজয়ের পর সেই এলাকার জনগণ সুলতান আইয়ুবীকে মোবারকবাদ জানাতে এলে তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। অনেক কষ্টে তিনি তার চোখের অশ্রু সংবরণ করলেন। জনতা বিদায় নিলে তিনি তার এক সেনাপতিকে বললেন, 'তোমরা কেন এ কথা অনুভব করতে পারছো না, তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে খৃষ্টানদের পরাজিত করতে এবং তাদেরকে আমাদের দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করতে। কিন্তু এ কয়টি বছর তোমরা শুধু তোমাদের ভাইদের সাথেই যুদ্ধ করছো।

এখন তোমরা হিসাব করে দেখো, শত্রুর রক্ত ঝরানোর পরিবর্তে আমরা এ যাবত একে অন্যের কত রক্ত ঝরিয়েছি? একে তোমরা বিজয় বলো? আমাদের এই গৃহযুদ্ধে যে-ই সফলতা লাভ করুক, সে বিজয় খৃস্টানদের। যখন দুই ভাইয়ের মধ্যে মারামারি ও লড়াই হয় তখন তা দেখে খুশী হয় শত্রুরা। সাফল্য যেটুকু তার সবটুকুই জমা হয় শত্রুর ভান্ডারে। এটাকে আমি সফলতা বা বিজয় বলতে পারি না যেগুলো আমি আমার মুসলমান ভাইদের থেকে লাভ করেছি।'

'খৃষ্টানরাও কম শিক্ষা পায়নি।' এক সেনাপতি বললো, 'এরপর

আমরা তাদেরও পরাজিত করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ।'
'কবে, আর কেমন করে? নিজেরা নিজেরা মারামারি করে?'
সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যুদ্ধের প্রথম নিয়মটা কি? সৈন্যদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা। খৃস্টানরা আমাদের সামরিক শক্তি আমাদের ভাইদের দিয়েই ধ্বংস করতে চেষ্টা চালাচ্ছে।'
তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। খৃষ্টানরা আমাদের এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।'
সুলতান আইয়ুবী আরো বললেন, 'নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন আছে তাদের? তারা তো দূর্গ থেকে বের না হয়েই আমাদের শক্তি দুর্বল করতে পারছে! ফিলিস্তিনের উপরও তাদের অধিকার ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে।'
এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না অফিসারের কাছে। তিনি চুপ করে রইলেন। সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'শাসন ক্ষমতা সর্বদা আল্লাহর হাতে। কিন্তু ক্ষমতার নেশা যখন মানুষের উপর চেপে বসে তখন ধর্ম ও জাতির সম্মান তো দূরের কথা, সে তার যুবতী মেয়ের ইজ্জতও বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। মিথ্যা ও প্রতারণাকে সে বৈধ বা জায়েজ করে নেয়।
তাইতো আজ খৃস্টানরা রাসুল (সা.)-এর মিল্লাতকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এর মোকাবেলায় আমরা কি করছি? কি করতে পারছি?'
এক সেনাপতি বললো, 'এই এলাকা থেকে সৈন্য ভর্তি বেশ ভালই চলছে। এখানকার যুবকরা স্বত:স্ফুর্তভাবেই সৈনিকের

খাতায় নাম লেখাচ্ছে।'
'কিন্তু এতে আমার কোন আনন্দ নেই।' সুলতান আইয়ুবী সকলকে বিস্মিত করে বললেন, 'এসব লোকেরা হয়তো আমাদের দলে শুধু এ জন্যই ভর্তি হচ্ছে যে, আমাদের সৈন্য বাহিনী যে শহর দখল করবে সেখানে তারা লুটতরাজ করতে পারবে। তাদের কেউ কেউ হয়তো নারীর ইজ্জত নিয়েও টানাটানি করতে চাইবে।'
'আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে এমন লুটপাট ও অপকর্মের কোন প্রশ্রয় কখনও দেই না।' সেনাপতি বললো, 'আপনার বাহিনীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ স্রেফ শত্রুদের মিথ্যা প্রচারণা। তারা আমাদের সেনাবাহিনীর সুনাম নষ্ট করার জন্য এমন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।'
'কিন্তু তারা কি বলছে? তারা বলছে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যরা লুটতরাজ করে এবং বিজিত এলাকার যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়।'
'শত্রুরা আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মুসলমান জনগণের কাছে ইসলামী সৈন্যদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তারা। যাতে তাদের মনে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মে, যাতে আমরা জনগণের সমর্থন না পাই, সহযোগিতা না পাই।'
সুলতান বললেন, 'এ কাজে কি তারা সফলতা পায়নি? আমরা যে শহর ও কেল্লা অধিকার করি সেখানকার সিপাই ও জনসাধারণ সবাই মুসলমান। তারপরও তারা আমাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করে। অথচ আমাদের বাহিনী লড়াই করছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী করার জন্য। অথচ এদের যারা মোকাবেলা করছে তারাও মুসলমান।'
সুলতান আরো বললেন, 'হে আমার বন্ধুরা! তোমরা শত্রুদের চিনে রাখো। তোমাদের শত্রুরা খুবই হুশিয়ার। তারা আমাদের সেনাবাহিনীকে জনগণের কাছে ঘৃণিত ও হেয় করার পথ বেছে নিয়েছে।
আল্লাহ তার কোরআনে মুসলিম মিল্লাতকে শিশা ঢালা প্রাচীরের মত অটুট থাকতে বলেছেন। জনগণ ও সেনাবাহিনীর মিলিত ঐক্যই এ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রাচীরে ফুটো করার পদ্ধতি হলো, জাতির কাছে ইসলামী শক্তিকে অযোগ্য, কাপুরুষ, ব্যভিচারী ও খুনী প্রমাণ করা। শত্রুরা এখন তাই করছে।'
'কিন্তু দাইয়ারে বাকারের লোকদের মাঝে এমন কোন প্রভাব তো দেখলাম না।' সালেম মিশরী বললো, 'তারা যখনই জানতে পারলো, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বাহিনী তাদের শহর অবরোধ করেছে এবং তাদের সরকার তাদেরকে দিয়ে সেই ইসলামী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করাচ্ছে, তখনই শহরের সিপাহী জনতা শহরের গেট খুলে দিল।'
'ওখানে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ গোয়েন্দা ও সমর্থক ছিল।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'সেখানকার সব বড় বড় মসজিদগুলোর ইমাম আমাদের লোক। সেখানে তারা শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাতই শিক্ষা দেন না, সেখানে তারা

খৃষ্টানদের পরিকল্পনা ও বেঈমান শাসকদের সম্পর্কেও ওয়াজ করে থাকেন।

তারা জনগণকে এ সত্য বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। আল্লাহ সেই জনপদে তার গযব নাজিল করেন যেখানে মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধ ও খুন খারাবী করে।

তোমরা জানো না, দাইয়ারে বাকারে খৃষ্টান গোয়েন্দারাও দরবেশ, সুফি ও আলেমের ছদ্মবেশে আছে। তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও আমাদের আলেমদের সাথে তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

আমাদের গোয়েন্দারাও গোপনে ও সুকৌশলে তাদের আওয়াজ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আমরা এখন যে এলাকায় যাচ্ছি সেখানে খৃস্টান ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবই বেশী এবং তারা সেখানকার জনগণকে এরই মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে।'

এক সেনাপতি সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি বলেছেন, এখানকার যুবকরা লুটপাটের আশায় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে এরা কি সমস্ত সেনাবাহিনীকেই খারাপ করে ফেলবে না?'

'তুমি কি দেখছো না তাদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তোমাকে প্রশিক্ষণ ও রণ কৌশলের যে নতুন পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছি তাতে তাদের চিন্তা চেতনা সঠিক পথেই ফিরে আসবে বলে আশা করছি। আমি

তাদের এমনভাবে সৈন্য বিভাগে বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা করেছি যে, ওরা সৈন্যদের উপর নয় বরং সৈন্যরাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।'

তিনি আরো বললেন, 'তুমি শিঘ্রই আমার লিখিত আদেশ পেয়ে যাবে। বিজিত অঞ্চলে আমাদের কোন সেনা লুটপাট করলে বা কোন নারীর প্রতি অশালীন আচরণ করলে তাকে সোজা তীরের নিশানা বানিয়ে নেবে। আর যদি তাকে হাতের কাছে পাও তবে তলোয়ার দিয়ে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। শত্রুদের ভিত্তিহীন দোষারোপ এভাবেই মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে।

বিজিতদের সাথে সেনাবাহিনীর আচরণ হবে আপনজনদের মত। আন্তরিকতা দিয়েই আমরা ওদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করবো। মনে রেখো, খৃষ্টান ও ইহুদীরা প্রত্যেক যুগে ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। তারা মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যবধান ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও জাতীয় প্রেরণা ধ্বংস করার জন্য তারা মুসলমানদেরই ব্যবহার করবে।'

সুলতান আইয়ুবী এখন ফোরাত নদীর কুলে ক্যাম্প করে বসে আছেন। এরই মধ্যে তিনি ছোট ছোট মুসলমান রাজ্যের শাসকদের তাবেদার বানিয়ে নিয়েছেন এবং বহু কেল্লার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এরা সেই মুসলমান শাসক যারা গোপনে খৃস্টানদের বন্ধু ও সুলতান আইয়ুবীর বিরোধী ছিল।

সুলতান আইয়ুবীর দু'চোখে তখনো ভাসছে বায়তুল মুকাদ্দাস।

যার উপর আজো আধিপত্য বিস্তার করে আছে খৃষ্টানরা। মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা উদ্ধারে অভিযান পরিচালনার পথে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অনেকটাই আজ অপসারিত হয়েছে।

বড় ধরনের অভিযান চালানোর আগে সৈন্যদের একটু বিশ্রাম দেয়া প্রয়োজন। সুলতান আইয়ুবী সে জন্যই ফোরাত নদীর কূলে ক্যাম্প করেছেন। তবে তিনি বসে থাকার লোক নন। এই অবসরে তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন। ঘোড়া ও উটের খোরাক এবং রসদপত্রের ঘাটতি পূরণ করাই হচ্ছে এই প্রস্তুতির মূল কাজ। প্রস্তুতি শেষ হলেই তিনি তাঁর চূড়ান্ত টার্গেট মসজিদুল আকসা উদ্ধার অভিযানে পড়বেন। কিন্তু কখন? সৈন্য ও সেনাপতিরা তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৭

ছোট বেগম

ক্রুসেড-২৬

ভন্ডপীর

আসাদ বিন হাফিজ